প্রকাশনার ৩৬ বছর

# অগ্রপথিক

অক্টোবর ২০২১

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) সংখ্যা

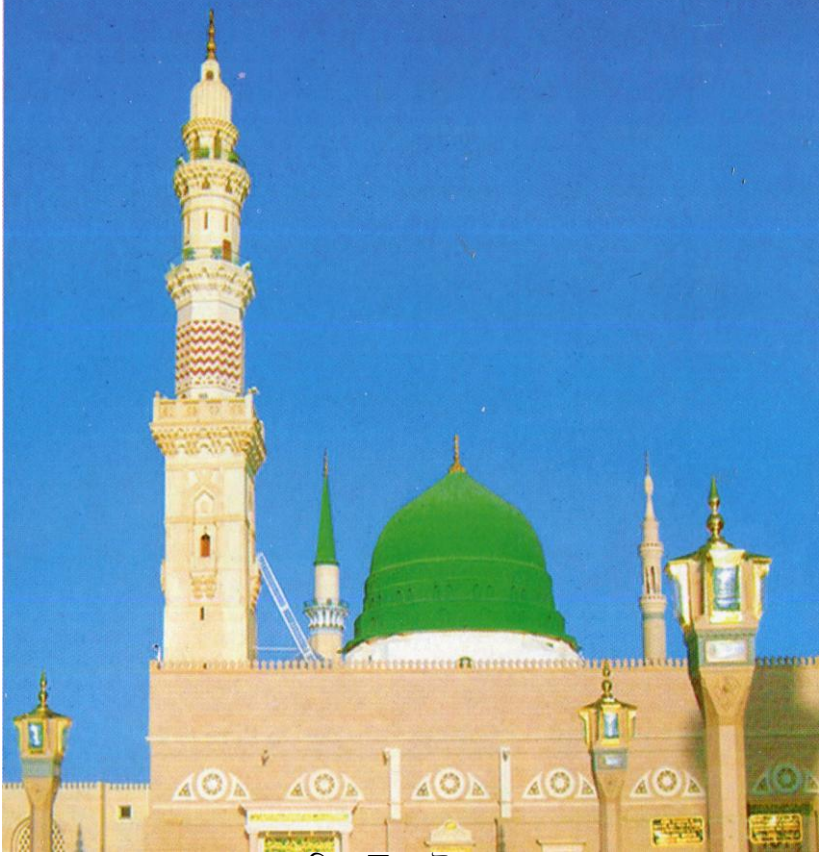

প্রকাশনার ৩৬ বছর

# অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ১০
অক্টোবর ২০২১ ॥ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৮ ॥ সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৪৩

প্রধান সম্পাদক
**ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান**

সম্পাদক
**মোহাম্মদ আনোয়ার কবির**

প্রকাশনা বিভাগ
**ইসলামিক ফাউন্ডেশন**
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

## নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

**প্রচ্ছদ**
**ফারজীমা মিজান শরমীন**

**মূল্য : ২০ টাকা**

যোগাযোগ
**সম্পাদক**
**অগ্রপথিক**
প্রকাশনা বিভাগ
**ইসলামিক ফাউন্ডেশন**
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

# স ম্পা দ কী য়

## পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)

মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আমাদের মাঝে আবার ফিরে এসেছে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস। এই মাসে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূল (সা) পৃথিবীর বুকে আগমন করেছিলেন এবং এই মাসেই তিনি ওফাত লাভ করেন। মানব জাতির এক ক্রান্তি লগ্নে মহান রাব্বুল আলামিন রাসূল (সা)-কে পৃথিবীর বুকে সর্বশেষ নবী রাসূল হিসেবেই পৃথিবীতে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। মানব জাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত পথের দিশা দেয়ার জন্যই সর্বশেষ নবী রাসূলের শেষে প্রেরণ করেছেন। আর তাই বলা যায় বিশ্ব মানবতার দিশারী, মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত রাসূলে পাক (সা)। পবিত্র কুরআন শরীফ-এর অসংখ্য জায়গায় মহান রাব্বুল আলামিন রাসূলে পাক (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। হাদিস শরীফ সমূহেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা পাওয়া যায়। মানব সভ্যতা বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবদান আজ সকল মানুষ ধর্ম মতের কাছেই স্বীকৃত। দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবজাতির জন্য মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল (সা)-কে রহমাতাল্লিল আলামিন বা রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। বিশ্ব মানবতা, বিশ্ব সভ্যতা যখন প্রচণ্ডভাবে হুমকির সম্মুখীন ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখনই তাঁর প্রিয় হাবীবকে এই পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেন। হিংসা, বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে, গোত্র গোত্রে কলহ, পাপ পঙ্কিলতায় পূর্ণ পৃথিবীতে শান্তির অমিয়ধারা নিয়ে এসেছিলেন রাসূলে পাক (সা)। তৎকালীন আরব জাতিকে মহান

রাব্বুল আলামিন এর কালেমার পতাকার তলে একত্রিত করেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে আল্লাহ তাআলার প্রদর্শিত পথে আহ্বান জানিয়েছেন মহানবী রাসূল (সা)। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আল্লাহর বাণী মানব জাতির দ্বারে পৌঁছেছে। বিশ্বে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ দূর করে আল্লাহর একত্ববাদকে তিনি দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাঅলার একত্ববাদকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন আদর্শকে বুকে ধারণ করে পৃথিবীর বুকে তা প্রচার করার জন্য তাঁর উম্মতের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা)-এর জীবন ইতিহাস আলোচনা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে, সত্য ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ধৈর্য্য ও সহনশীলতার কোন বিকল্প নেই। রাসূল (সা)-এর শুভাগমন-এর এই পবিত্র দিন ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)-এ আমরা যেন আল্লাহর বাণী আল কুরআন এবং তাঁর জীবনাদর্শ আল হাদিসের আলোকে নিজেদেরকে আমৃত্যু রাখতে পারি রাব্বুল আলামিন এর দরবারে এই মুনাজাত করি। আল্লাহ তাআলার প্রদর্শিত পথ এবং রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে পৃথিবী সকলের জন্য শান্তিময় হোক মহান রাব্বুল আলামিন এর দরবারে আমরা এই মুনাজাতও জানাই।

## শেখ রাসেল দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল'র জন্মদিন ১৮ অক্টোবর। ১৯৬৪ সালের এদিনে রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের কালরাত্রিতে বাবা-মা-ভাই-ভাবীদের সাথে শিশু রাসেলও শহীদ হোন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়। শিশু রাসেল হত্যা প্রমাণ করে হত্যাকারীরা এক পরাজিত জিঘাংসা থেকে বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর। গত ২৩ আগস্ট মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এ বছর থেকে শিশু রাসেলের জন্মদিন ১৮ অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস' ক শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু রাসেল বাঙালি জাতি, বাংলাদেশের কাছে অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হিসেবে বিরাজ করবে। শিশু রাসেলের জন্মদিন 'শেখ রাসেল দিবস' উপলক্ষে অগ্রপথিক পত্রিকা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শিশু রাসেল ও ১৫ আগস্টের শহীদদের স্মরণ করছে। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে মুনাজাত জানাই ১৫ আগস্টের শহীদ প্রত্যেকে জান্নাতের উঁচু মাকাম লাভ করুক। আমীন।♦

## সূচি

### প্রবন্ধ-নিবন্ধ


**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)**

ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন
মহানবী (সা)-এর কৃষি উন্নয়ন কৌশল♦০৯

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)-এর আয়োজন :
ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে♦১৬

মিরাজ রহমান/ শাহ মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ
যেভাবে কাটতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
দিন-রাত : রাসূল (সা)-এর দৈনন্দিন রুটিন♦২৮

মূল : ফারহাত নাজ রহমান
অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ
শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ে মহানবী (সা)♦৫৫

শামস সাইদ
মহানবী (সা)-এর আদর্শ ও সর্বজনীনতা♦৬৩

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান
রাসূল (সা)-এর উপর নির্যাতন ও হিজরতের সূচনা♦৭০

**শেখ রাসেল দিবস**

টুটুল রহমান
শেখ রাসেল : যে প্রিয় নাম ভোলে না বাঙালি♦৮৭

**মুজিববর্ষ**

তোয়াব খান
আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব♦৯৩

**আন্তর্জাতিক**

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক
মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের সমসাময়িক অবস্থান : একটি পর্যালোচনা♦৯৯

**কবিতা**

খালেক বিন জয়েনউদদীন
তোমারই উদ্দেশ্যে♦১০৬
সোহরাব পাশা
বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা) ♦১০৭
আ শ ম বাবর আলী
খোদার হাবীব বিশ্বনবী♦১০৮
আবুল হোসেন আজাদ
মোহাম্মদ রাসূল (সা) ♦১০৯
মোহাম্মদ ইলইয়াছ
নূরের কিস্তিতে♦১১০
মিলন সব্যসাচী
শির করে দাও নত♦১১১
বাবুল তালুকদার
প্রতি মুহূর্ত বেদনা আর কষ্ট♦১১২
আবদুস সালাম খান পাঠান
বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলে করীম (সা) ♦১১৩

**গল্প**

মনি হায়দার
একটা যাদুঘরের স্বপ্ন♦১১৪

**বিশ্ব শিক্ষক দিবস**

মঈনুল হক চৌধুরী
শিক্ষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও দর্শন♦১২০

**স্মরণ**

মো. বশির হোসেন মিয়া
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম :
রাসূলপ্রেমিক আলেম♦১২৫

# পরশমণি

**আল-কুরআন**

১। আপনি বলে দিন, আল্লাহর ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) এর উপর তারা যেন খুশি উদপাযন করে। এটি তাদের অর্জিত সমুদয় সঞ্চয় হতে উত্তম। *(সূরা ইউনুস : ৫৮)*

২। স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি কিতাব ও হিকমত যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি এরপর যদি তোমাদের নিকট এমন রাসূল আসেন যিনি তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন করবেন তখন তোমরা সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করেছ? এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। *(আলে ইমরান : ৮৯)*

৩। আমি আপনাকে সমগ্র জাহানের জন্য কেবল রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি। *(সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭)*

৪। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদেরকে ভাব প্রকাশ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। *(আর রাহমান : ৩-৪)*

৫। আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। *(ইবরাহীম : ৩)*

## আল-হাদীস

১। হযরত ইরবাদ বিন সারিয়া (রা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসেবে লিখিত ছিলাম যখন আদম (আ) কাদা মাটির মাঝে মিশ্রিত ছিল। আর অচিরেই আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। আমি হলাম ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফসল, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের ঐ দর্শন যেটা মা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, তিনি আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছেন এমতাবস্থায় তাঁর থেকে একটি নূর বের হলো যা তাঁর সামনে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত করেছিল। *(সারহুস সুন্নাহ লিলবাগাভী, মিশকাত)*

২। হযরত আবু কাতাদা (রা) একদা তাঁকে প্রতি সোমবার রোযা পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, এ দিন আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ দিনই আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। *(মুসলিম, মিশকাত)*

৩। হযরত কা'ব আহবার (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নিশ্চয়ই হযরত আদম (আ) ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টবস্তু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সৃষ্টির কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে। *(বায়হাকী)*

৪। হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন: আমার নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আরজ করলেন, ইয়া মুহাম্মাদু! আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি যদি আপনাকে পয়দা না করতাম তাহলে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করতাম না। *(মারফু সূত্রে, দায়লামী শরীফ)*

# মহানবী (সা)-এর কৃষি উন্নয়ন কৌশল

**ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইহকাল-পরকাল, বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের নাম ইসলাম। ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনের কথা যেমনি ইসলামে বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে কৃষিনীতি, শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতির সমন্বয়যুক্ত এক সুষম ও ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা। যতদিন পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ না করবে, ততদিন জাতিসংঘ আইএমএফ বা ডব্লিউটিওর মতো সংস্থা গঠন করেও বিশ্ব অর্থনীতির

অস্থিতিশীলতা দূর করা যাবে না। স্থিতিশীল বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলাম কৃষি ও শিল্পের মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করে দিয়ে শুধু মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করেনি; বরং তাবৎ দুনিয়ার মানুষের জন্য সুষম জীবন ব্যবস্থার সন্ধান দিয়েছে। কৃষিনির্ভর দেশগুলোর এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত।

মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আবার মাটিতেই মিশে যাবে। এ মাটিকে চাষাবাদ করেই মানুষ বেঁচে থাকবে। জন্মে যেমন মাটি প্রয়োজন, তেমনি মৃত্যুর পরেও মাটি প্রয়োজন। এই মাটি চাষাবাদ করে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নাম কৃষি। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে : "সৎ পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত খাদ্যই যে কোনো লোকের পবিত্রতম বা সর্বোত্তম হালাল খাদ্য।" হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক (সা) ইরশাদ করেন: "কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা খাদ্যশস্যের বীজ বপন করে, অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখি অথবা পশু কিছু অংশ খায়, তবে তার জন্য বর্ণিত, রাসূলে পাক (সা) ইরশাদ করেন: 'যে ব্যক্তি এমন অনাবাদি জমি আবাদ করে যা অন্যের নয়, সে ওই জমির মালিক হবে।' (বুখারী)

সূরা কাফ-এর ৯-১১ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে : আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং এর মাধ্যমে বাগান ও শস্য উৎপন্ন করি। যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়, খেজুর বৃক্ষ থেকে, যাতে রয়েছে থোকা থোকা খেজুর– বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টির মাধ্যমে আমি মৃত যমীনকে জীবন দান করি। এমনিভাবেই ঘটবে পুনরুত্থান।" কৃষি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া হলো কৃষকের কাছে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি পৌঁছে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন সাধন করা। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : '(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সব ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করে থাকি এবং ফলাই সবজি ক্ষেত। এ থেকে আমি উৎপন্ন করি খোসাযুক্ত দানাদার শস্য, খেজুর গাছ থেকে শাখাযুক্ত খেজুর বের করে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। জান্নাতবাসী খুবই সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে থাকবে, কোনো কাজ করতে হবে না। যা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। যদি কেউ কৃষিকাজকে ভালোবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থা করা হবে।" তাবারানীর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, জান্নাতে এক ব্যক্তি কৃষিকাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবেন। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, কর্তন ও পাকা কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। (তাফসির মারেফুল কোরআন পৃ. ১৬৭১)।

বীজ কৃষির মূল ভিত্তি। বীজ ছাড়া কৃষি উৎপাদনের কথা চিন্তাই করা যায় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করেন; 'তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন

সৃষ্ট জীবের জন্য। এতে আছে ফল-মূল এবং রসযুক্ত খেজুর বৃক্ষ এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধি গুল্ম।' (সূরা আর-রহমান: ১০-১২)

"তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা সেটা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছে করলে সেটা খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি। তখন তোমরা অবাক হয়ে যাবে।" (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৬৩-৬৫)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বীজ ও আঁটি থেকে বৃক্ষ সৃষ্টিকারী। তিনি জীবিতকে মৃত, মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ, তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছ কেন?" (সূরা আনআম : ২৯)

কৃষির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্য। কৃষক অনেক পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করেন, ফলন ভালো হলে আনন্দিত হন। তাই কৃষকরা আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদাবান। আল্লাহ বলেন : "তাদের দৃষ্টান্ত যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে বের হয় কুঁড়ি, অতঃপর সেটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং কাণ্ডের ওপর দৃঢ় ভাবে দাঁড়ায়, যা কৃষকদের জন্য আনন্দদায়ক।" (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ কৃষক এবং জমির মালিক ছিলেন আনসারগণ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনার দ্বারাই এটি প্রমাণ করা যায়নি যে, সেকালে জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার সম্পর্কে আজকের পুঁজিবাদী নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার মতো ছিল। প্রকৃত চাষীদের মধ্যে ভূমির সুষম বন্টন করাই হচ্ছে ইসলামের মূল বিধান। রাসূলে পাক (সা) নিজে 'জারেক' নামক স্থানে কৃষি ফসলাদি উৎপদান করেছেন বলে হাদীসে পাকে উল্লেখ আছে। সেচের উদ্দেশ্যে কূপ খনন করাকে ইসলাম অতি সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন : 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকে রেখে ঘাস উৎপাদন করা নিষিদ্ধ।' তিনি আরো বলেছেন : 'রূমার কূপ খননকারীর জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।' (বুখারী) এ সংবাদ শুনে উসমান (রা) এ কূপ খনন করেন। পবিত্র কুরআনে কৃষি উৎপাদনকে বিশ্ব মানবের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে: "আচ্ছা, তাহলে তোমরাই বল তো! যেসব ক্ষেত-খামার তোমরা চাষাবাদ করে যাচ্ছ, তাও কি তোমরা দেখনি? আমি যখন ইচ্ছা করি, সেসব ভস্মে পরিণত করে ফেলি। আর তোমরা অবাক হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে থাক, নিঃসন্দেহে আমাদের ওপর গযব নেমে এসেছে। এমনকি আমরা সব হারালাম" (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৬৩-৬৭) আয়াতে কারিমার গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেন: "জমির গভীরে গিয়ে জীবিকা অন্বেষণ কর।" (বুখারী) আল্লাহ বলেন : দুটি দরিয়া এক

রকম নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং অপরটির পানি লবনাক্ত ও বিস্বাদ। তোমরা প্রত্যেকটি থেকে মাছ ধরে এর তাজা গোশত খাও।" (সূরা ফাতির : ১২)। সূরা ইউসুফের ৪৭-৪৮ আয়াতে রয়েছে : "তিনি ইউসুফ (আ) বললেন, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যে ফসল পাওয়া যাবে তার মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ তোমরা আহার করবে। অবশিষ্ট শস্য শীষসমেতে রেখে দেবে। আর এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তোমরা এদিনের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলে তা খেয়ে যাবে কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে।" সূরা কাহফের ৪৫-৪৬ আয়াতে আল্লাহ বলেন : "পার্থিব জীবনের উপমা বৃষ্টিধারার বর্ষণে ভূমিতে উদ্ভিদ উদ্গত হয়, অনন্তর তা বিশুষ্ক-বিচূর্ণ হলে বায়ু এদের উড়িয়ে নিয়ে যায়। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কিন্তু সৎকার্য আল্লাহ্র কাছে প্রতিদানে শ্রেষ্ঠতর।" মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালন ও ফসল ফলানোর মাধ্যমেই কৃষিকাজ সীমিত নয়। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের পেটের ভাত, পরনের কাপড়, থাকার জায়গা, স্বাস্থ্যসেবা, পথ্য, শিক্ষা সরঞ্জাম, পানি, বিদ্যুৎ যানবাহন সবকিছুর মূল উপাদান কৃষি থেকে আসে।

বিশ্ব অর্থনীতির স্বার্থে কৃষি উন্নয়ন একটি মৌলিক ও জরুরি বিষয়। অর্থনীতির এ পরম সত্য কথাটিই আজ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী আগে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন। আধুনিক সুমলিম বিশ্বের দেশগুলোর কোনটিই শিল্পে সমৃদ্ধ নয়। আল্লাহ পাক তাদের দেশে কোটি কোটি ডলারের তেলসম্পদ সংরক্ষিত রেখেছেন মাটির নিচে। আধুনিক অর্থনীতিতে ভূমি বলতে কেবল মাটিকেই বোঝায় না, বরং পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ভূগর্ভস্থ সম্পদ-এ সবই ভূমির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তৎকালীন আরব দেশ কোনো কৃষি প্রধান দেশ ছিল না। কিন্ত তবুও বিশ্বনবী (সা) কৃষি উন্নয়নের যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, তা আজ বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর জন্য অনুসরণযোগ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নির্দেশিত কৃষি উন্নয়ন কৌশলগুলো মুসলমানদেরই দেশি অনুসরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রেরিত বাণী থেকে এর সুষ্ঠু সমাধান না করে মুসলমানরা অনৈসলামিক কৃষি অর্থনীতি অনুকরণ করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর হযরত উমর ফারুক (রা) মুসলমানদের দুর্দশার কথা বুঝতে পেরেই ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর একটি যুগোপযোগী কৃষি অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী মুসলিম দেশগুলোতে এসব কৌশল ও নীতি অনুসৃত হয়নি। আজকের মুসলিম দুনিয়ায় কৃষি প্রধান দেশগুলো

শিল্পোন্নত পশ্চিমা দেশের কাছে যিম্মী হয়ে আছে। অনেকেই প্রশ্ন করবেন, শিল্প ও উন্নয়ন টেকনোলজির মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো যেখানে উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চরম শীর্ষে অবস্থান করছে, সেখানে কৃষির ওপর এত গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম বিশ্বের লাভ কী ? এ ধরনের এক প্রশ্নের ইঙ্গিতেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বলেছেন, ওই অর্থনীতি কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, যেখানে কৃষিকে অবজ্ঞা করে শিল্পকে অস্ত্রের জোরে বা গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা হয়। এরূপ অর্থব্যবস্থার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

ইসলাম চায়, পৃথিবীর সব জাতি ও রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না করলেও অন্তত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক ভূমিকা পালন করুক। কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পপ্রধান দেশকে এবং শিল্প প্রধান দেশ কৃষিপ্রধান দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করুক। কুরআনে পাক এবং হাদীস শরীফ থেকে সংক্ষিপ্ত সামান্য কিছু উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে কৃষিকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। যে দেশের কৃষকরা যত বেশি স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী, সে দেশ তত উন্নত, সুখী--সমৃদ্ধ। স্বয়ং আল্লাহ এবং রাসূল (সা) কৃষিকাজের নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষিকাজ সবচেয়ে পুণ্যের, সবচেয়ে বেশি সওয়াবের। মানুষের মৃত্যুর পরেও যার সুফল পাওয়া যায়, সেই সদকায়ে জারিয়া হচ্ছে কৃষিকাজ।

**মহানবী (সা) কৃষি উন্নয়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ বলেন-**

'পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, যাদের সবার জীবিকা সংস্থানের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন বা করবেন তাদের সবারই খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন (১১:৬)। চাষাবাদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে খাদ্যের সংস্থান করা মানুষের কর্তব্য।

আসহাবে রাসূলগণ রাত-দিন তাদের শস্য ক্ষেতে, বাগানের মধ্যে কাজ করতেন এবং নামাজের সময় হলে সেখানেই নামাজ আদায় করতেন।

কুরআন কৃষিকর্মের গুরুত্বের ওপর যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত প্রদান করেছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবিগণ কৃষিক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার দ্বারা কেবল আরব উপদ্বীপই নয়; বরং আরব উপদ্বীপের বাইরেও কৃষিব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়।

বস্তুত কৃষিকাজ একটি উত্তম পেশা। এ পেশায় নিয়োজিত থেকে নিজের, পরিবারের এবং দেশের মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কৃষিকাজ করতে হবে। জমি থেকে উৎপাদিত খাদ্যগ্রহণ করে ইবাদত বন্দেগি করা হবে, এ নিয়ত করে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ

করতে হবে। এভাবে নিয়ত করলে কৃষিকাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে।

মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা)-এর নিকট নাজিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে দেয়া তাঁর অকৃপণ অনুগ্রহ ও উপকরণসমূহের উল্লেখ প্রসঙ্গে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকার্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআন বলছে, 'তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি এবং আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে এবং আঙুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন বিভিন্ন গাছের প্রতি লক্ষ্য কর- যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য। (৬:৯৯)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষিকাজের জন্য কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও উৎসাহব্যঞ্জক বাণী রয়েছে। একে আল্লাহপাক নিজ অনুগ্রহেই সহজ করে দিয়েছেন। কেউ কৃষিকাজে নিয়োজিত হলে আরও অতিরিক্ত ফায়দা হাসিল করতে পারে। কেননা আল্লাহ কৃষি উৎপাদনকে বিশ্ব মানবের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন।

কৃষির উন্নতি বিধানে তৎপর হওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর ফরজ। কারণ কৃষির উন্নতি ছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের হেফাজত অসম্ভব। আরব উপদ্বীপের বিস্তৃত এলাকা অন্য কথায় অধিকাংশ এলাকাই বালুকাময় মরুভূমি ছিল। রাসূল (সা) মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে বহু অনাবাদী জমি চাষাবাদের জন্য বন্দোবস্ত দান করেন বুখারী শরিফে বর্ণিত আছে।

অধিক শস্য ফলানোর জন্য রাসূল (সা) সেচ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সাহাবিদেরকে এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

মহানবী (সা) সাহিবুল হিমা বা চারণভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও নিয়োগ দান করেন। হিমা শব্দের অর্থ রক্ষা করা বা আশ্রয় দেয়া এবং বিশেষ অর্থে বোঝায় পশু চারণ ভূমি। মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট প্রতিষ্ঠার পর মহনবী (সা) রাজধানী শহরের বাইরে কিছু জমিন মুসলিমদের হিমা রূপে চিহ্নিত করে দেন। সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পবাদিপশু চরত। গবাদি পশু রক্ষা এবং অবাধ

অনুপ্রবেশকারীদের রোধ করার জন্য মহানবী (সা) কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন আমলে সংরক্ষিত আরো অনেক পশুচারণ ভূমি ছিল।

মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। কৃষির গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য এবং জনগণকে কৃষির প্রতি আগ্রহী করার জন্য মহানবী (সা) কৃষির অনেক গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অকল্পনীয়।

মহানবী (সা)-এর শাসনামলে মদীনা কৃষিকাজে সমৃদ্ধ ছিল। মহনবী (সা)-এর উৎসাহ পেয়ে কৃষি ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধিত হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রা) এর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদীনার আনসাররা তাদের জতিতে চাষাবাদ ও বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকত। মদীনার প্রধান কৃষিপণ্য ছিল যব ও গম। মদীনার প্রচুর খেজুর উৎপাদিত হতো। মদীনার ফল ও ফসলের মধ্যে খেজুর ছিল প্রধান। এছাড়া আনজির, আঙুর, আনার প্রভৃতি ফলও উৎপাদিত হতো।

মদীনার সব জমি উর্বর ও উৎপাদশীল ছিল না। বীজের বেঁচে থাকা, অঙ্কুরিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ও ফল ধরার জন্য প্রয়োজন পানির। মদীনায় বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখা হতো। পরিকল্পিত সে ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির অগ্রগতির ব্যবস্থা হয় মহানবী (সা)-এর শাসনামলে। কোন ফসলে কখন ও কী পরিমাণ সেচ দিতে হবে তা মদীনাবাসীদের ভালোই জানা ছিল। মদীনার কৃষি জমিগুলোতে ফসল ফলানোর জন্য পানি সেচ দেয়া হতো। এতে বৃষ্টির স্বাভাবিক পানির প্রবাহ যেমন ছিল তেমনি কুয়া ও ডোবার পানিতে সেচের মাধ্যমে কৃষি জমি দেয়া হতো।

মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকরা আল্লাহ প্রদত্ত পানির যথাযথ ব্যবহার করত। আল্লাহর বাণী তাদের কাছে ছিল অনুসরণের জন্য।

মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য যে কৃষিনীতি প্রদান করেন, তা অনন্য। এই কৃষি নীতিতে ভূমি বণ্টন, ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসল ভোগ ও বন্টনের বিস্তারিত নীতিমালা বিধৃত ছিল। মহানবী (সা)-এর শাসনামলে এই কৃষিনীতি নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়েছিল।♦

*লেখক : সাবেক অধ্যক্ষ সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। বিসিএস (সাধারণ) শিক্ষা ক্যাডার।*

# ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)-এর আয়োজন ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে

## মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম ও ওফাতসহ জীবন ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে তাঁর কালজয়ী আদর্শ অনুসরণ করার আহ্বান জানানো এবং সেগুলো অনুসরণ করা এবং তাঁর শানে মাহফিলের আয়োজন করা যায়। বিশেষ করে রবিউল আউয়াল মাসের মধ্যে বেশি পড়ে বিমোহিত হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তায়ালা। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)- এর বিখ্যাত হাদীস শরীফটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মাটির উপর নবীদের শরীর মোবারক খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন'। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু তিনি নন, সমস্ত নবীগণের দেহ মোবারক কবরে অক্ষত আছে।

সমস্ত নবী তাঁদের নিজ নিজ রওযা শরীফে জীবিত রয়েছেন। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদিস রয়েছে আনাস (রা) হতে বর্ণিত মি'রাজে হযরত মূসা (আ)-এর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) দেখেন, 'তিনি মূসা তাঁর মাযারে কবরে নামায পড়ছেন।'

(ক. ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম নাসায়ী : সুনান : ৩/১৫১ : হাদিস : ১৬৩৭, ইমাম আহমদ : মুসনাদ : ৩/১২০ পৃ, ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ১৩/৩৫১ : হাদিস : ৩৭৬০, ইমাম ইবনে হিব্বান : আস সহীহ : ১/২৪১ : হাদিস : ৪৯, ইমাম আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ১৪/৩০৮ : হাদিস : ১৮৩২৪, ইমাম নাসায়ী : সুনানে কোবরা : ১/৪১৯ : হাদিস : ১৩২৯, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল মুসনাদ : ৭/১২৭ : হাদিস : ৪০৮৫, ইমাম মানাবী : ফয়জুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃ. হাদিস : ৩০৮৯, আল্লামা মুকরিজী : ইমতাঈল আসমা'আ : ১০/৩০৪ পৃ:)

অনুরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আরও সহীহ হাদিস রয়েছে, তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টি– 'রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাত্রে আম্বিয়া এর এক বিরাট জামাতকে দেখেছি, মূসা (আ)-কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছি। তাকে দেখতে মধ্য আকৃতির চুল কোকরানো সানওয়া দেশের লোকের মত। আমি ঈসা (আ)-কে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি, তিনি দেখতে ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী'র মত। তার পরে নামাযের সময় আসলো আমি সকল নবী এর ইমামতি করলাম।'

(ক. ইমাম মুসলিম : সহীহ : ফাযায়েলে মূসা ১৫৭/১ হাদিস : ১৭৩,খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৩/২৮৭ : হাদিস : ৫৮৬৬, ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃ, ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী : শিফাউস-সিকাম : ১৩৫-১৩৮ পৃ. ইমাম সূয়ূতী : আল-হাভীলিল ফাতওয়া : ২/২৬৫ পৃ, ইমাম সাখাভী : কওলুল বদী : ১৬৮ পৃ, ইমাম মুকরিজী : ইমতাঈল-আসমা: ৮/২৪৯ পৃ)

উপরের হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় হযরত মূসা সহ সকল নবী তাঁদের নিজ নিজ রওযা শরীফে জীবিত এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত থাকার পরও আবার বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল, তাঁদের জীবন শুধু কবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা না হলে তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূল (সা)-এর পেছনে নামায পড়তে গেলেন কিভাবে? আর শরীয়ত মতে শর্ত হলো নামাযের জন্য যাহেরী জিসিম বা দেহ থাকার একান্ত প্রয়োজন। যে বোরাকে আবার যখন রাসূল ৬ষ্ঠ আকাশে গেলেন তখন দেখেন হযরত মূসা সেখানে উপস্থিত হয়ে রয়েছেন এবং এমনকি আমাদের আখিরী যামানার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায তাঁরই উসিলাতে কমে ৫ ওয়াক্তে রূপান্তরিত হলো। (মিশকাতুল মাসাবীহ, মি'রাজ অধ্যায়, বুখারী, মুসলিমের সূত্রে)। নবীজি মূসা (আ)কে এক সময়ে মোট ৩ এরও অধিক স্থানে দেখলেন। আমাদের রাসূল এর

অনেক পরের মর্যাদার নবী মূসা (আ) যদি ওফাতের পরেও বহু স্থানে উপস্থিত হয়ে আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদিকে সাহায্য করতে পারেন তাহলে আমাদের নবীজি ওফাতের পরে শুধুমাত্র দুনিয়াতেই একাধিক স্থানে উপস্থিত হতে পারবেন না কেন?

নবীজি অনেক নবীদেরকে তাদের কবরে দেখেছেন, আবার বায়তুল মুকাদ্দাসেও দেখেছেন, আবার তাদেরকেই অনেককে আসমানে দেখেছেন; তাহলে তাঁরা ওফাতের পরেও বহু স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন তাহলে আমাদের নবী করীম (সা) ওফাতের পরে একাধিক স্থানে উপস্থিত হতে পারবেন না কেন?

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (র) (ওফাত ৯১১ হি.) এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আনবায়ুল বি হাঅ্যাতুল আম্বিয়া' এর ৭ পৃষ্ঠায় লিখেন- "উম্মতের বিবিধ কর্ম কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দুআ করা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তার জানাযাতে অংশগ্রহণ করা, এগুলোই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সখের কাজ। অন্যান্য হাদিস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।" (সুয়ূতি, আল-হাভী লিল ফাতওয়া, ২/১৮৪-১৮৫ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন)

বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (র) তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মূলকের ২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন– 'সূফী সম্রাট হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জলী (র) বলেছেন, হুযুর (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের রূহ মোবারক সাথে নিয়ে জগতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের ইখতিয়ার আছে। তাই অনেক আওলিয়া কিরাম তাঁদেরকে দেখেছেন।' (ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ১০/৯৯ পৃ. সূরা মুলক, আয়াত নং ২৯।)

**নবীগণ ও আল্লাহর ওলীগণ এক সময়ে বহু জায়গায় উপস্থিত হয়ে থাকেন**

আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তো কোন তুলনাই চলে না। অনুরূপ মোল্লা আলী ক্বারী (র) বলেন– 'ওলীগণ একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায় বিচরণ করতে পারেন। একই সময়ে তারা একাধিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন।' (আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত, ৪/১০১ পৃ. হাদিস– ১৬৩২)

**ওলীদের এই অবস্থা হলে নবীদের কী হবে?**

শিফা শরীফে ইমাম কাযী আয়ায আল-মালেকী (র) একটি হাদীস সংকলন করেন-

-'যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।' (ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ২/৪৩ পৃ.)। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) শরহে শিফা গ্রন্থে লিখেন- 'কেননা, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র রূহ মুসলমানের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন।' (আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা : ২/১১৮ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন)। তাহলে কী ইমাম মোল্লা বাতিল পন্থীদের ফাতাওয়ায় কাফির ছিলেন?

-বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন– 'যখন মসজিদের মধ্যে কোন লোক থাকবে না তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম দিবে এবং যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, হে আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণ আপনাদের প্রতি সালাম।' (ইমাম কাযী আয়ায : শিফা তাহরিফে হুকুকে মোস্তফা : ২/৬৭ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।)

-'হযরত আমর ইবনে হাযম বলেন রাসূল (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তিনি বলতেন– আল্লাহর নাম নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক। তারপর প্রবেশের দোয়া বলতেন.....।' (ইমাম আবদুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ : ১/৪২৫ পৃ. হাদিস : ১৬৬৩)

পাঠকবৃন্দ! এটি তিনি আমাদের শিখানোর জন্যই বলতেন।

'হযরত আবু হুরায়রা (রা) কা'ব বিন উযরাহ কে বলেন, তুমি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম দিবে ও বলবে যে.....। আর যখন মসজিদ হতে বের হবে তখনও নবী দোজাহানকে সালাম দিবে তারপর বলবে.....।" (ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ,: ১/২৯৮ পৃ. হাদিস : ৩৪১৫ ও ৬/৯২ পৃ. হাদিস, ২৯৭৬৭)

এই ব্যাপারে আরেকটি হাদিসে দেখুন-

-'নিশ্চয়ই হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম তিনি যখন কোন মসজিদে প্রবেশ করতেন তিনি প্রথমে নবীয়ে করীম (সা)-কে সালাম দিতেন তাপর প্রবেশের দোয়া বলতেন।' (ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৬/৯৭ পৃ. হাদিস : ২৯৭৬৮ (খ) ইবনে আবি উসামা ইবনে হারেস (ওফাত ২৮২ হি.), মুসনাদে হারিস, ১/২৫৪ পৃ. হাদিস, ১/২৫৪ পৃ. হাদিস, ১৩০)

এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস–

'হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে অতঃপর সে যেন তাঁর রাসূলের প্রতি সালাম দেয়। তাপর বলবে এই দোয়া.....।'

(১. সুনানে দারেমী, ২/৮৭৬ পৃ. হাদিস, ১৪৩৪, ২. সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২৫৪ পৃ. হাদিস, ৭৭২, আলবানী এ হাদিসের তাহক্বীকে সনদটিকে সহিহ বলেছেন, ৩. বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৬১৯ পৃ. হাদিস ৪৩১৭ ও ২/৬১৯ পৃ. হাদিস ৪৩১৯, ৫. আবূ দাউদ, আস্-সুনান, ১/১২৬ পৃ. হাদিস, ৪৬৫ ৬. বায্যার, আল-মুসনাদ, ৯/১৬৯ পৃ. হাদিস ৩৭২০ ৭. নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ১/৪০৪ পৃ. হাদিস ৮১০ ৮. নাসাঈ, আমালুল ইউয়াম ওয়াল লাইলা, ১/২২০ পৃ. হাদিস ১৭৭ ৯. আবূ আওয়ানাহ, আল-মুসনাদ, ১/৩৫৪ পৃ. হাদিস ১২৩৪ ১০. ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ৫/৩৯৭ পৃ. হাদীস ২০৪৮)

এই বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা হতেও আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে।

(১. সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২৫৪ পৃ. হাদিস, ৭৭৩, আলবানী এ হাদিসের তাহক্বীকে সনদটিকে সহিহ বলেছেন, ২. বায্যার, আল-মুসনাদ, ১৫/১৬৮ পৃ. হাদিস ৮৫২ ৩. ইবনে খুযায়মা, আস্-সহিহ, ১/২৩১ পৃ. হাদিস ৪৫২, আলবানী বলেন এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ ৮. ও ৪/২১০ পৃ. হাদিস ২৭০৬ (৯-১০) ইবনে হিব্বান, আস্-সহীহ, ৫/৩৯৫ পৃ. হাদীস ২০৪৭)

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) 'ফয়যুল হারামাঈন' কিতাবে নিজের মতামত প্রকাশ করে বলেন– 'আমি রাসূল (সা)-কে অধিকাংশ দ্বীনি ব্যাপারে তার নিজ আকৃতিতে আমার সম্মুখে বার বার দেখেছি। এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, তার রূহ মোবারকের এমন বিশেষ শক্তি রয়েছে যে, তা তার আকৃতি ধারণ করতে পারে। এটা রাসূল (সা)-এর ঐ উক্তির ইঙ্গিত যে, নবীগণ মরে না, তারা নিজ নিজ কবরে নামায পড়ে থাকেন, তারা হজ্জ করে থাকেন এবং তাঁরা জীবিত আছেন।' (শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী : ফয়যুল হারামাঈন : ২৪৫ পৃ)

সূফী ইমাম শা'রানী (র)-এর অন্যতম গ্রন্থ 'লি ওয়াকহিল আনওয়ার আল কুদসিয়্যাতুল উহুদিল মাহমুদিয়্যাহ' এর ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, আমার পীর শেখ নূরুদ্দীন শাওনী (র) প্রতিদিন দশ হাজার বার দরূদ পড়তেন আর (তার শায়খ) শেখ আহমদ যাওয়াভী (র) চল্লিশ বার তার অযিফা পড়তেন। তিনি একবার আমাকে (শা'রানী কে) বললেন– "আমাদের বাধা নিয়ম এই যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর উপরে এত অধিক সালাত (দরূদ) পড়তাম যাতে তিনি জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নিকট বসতেন, সাহাবাগণ যেমনিভাবে তাঁর সাহচর্য যেরূপ লাভ করেছেন, আমরাও সেরূপ সাহচর্য লাভ করতাম, আমাদের দ্বীনি বিষয়গুলো তার নিকট ফয়সালা করে নিতাম, যে সমস্ত হাদিস মুহাদ্দিসগণ, হাফেযগণ দ্বঈফ বলেছেন, ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর জেনে নিতাম এবং তাঁর নাম

অনুসারে ঐ সমস্ত হাদিসের উপরে আমল করতাম। যে পর্যন্ত আমরা ঐ পর্যায়ে না পৌঁছতাম, সে পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে সালাত (দরূদ) সুস্পষ্ট পাঠকারী বলে গণ্য করতাম না।"

দেওবন্দীদের পীর এবং পীরানে পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র) থেকে মীলাদে নবীজী হাজির-নাজির হওয়া প্রসঙ্গে দলিল পেশ করছি। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শামায়েলে এমদাদীয়া' এর মধ্যে বলেন, 'মীলাদ শরীফে' কিয়াম করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এখন ভূমিষ্ট হচ্ছেন এই ধরনের খারাপ বিশ্বাস না রাখা উচিত। আর যদি মাহফিলে তাশরীফ আনেন এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে অসুবিধা নেই। কারণ, এই নশ্বর জগতে কাল ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। আর পরকাল স্থান-কালের সম্পর্ক থেকে মুক্ত।" (হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : শামায়েলে এমদাদীয়া : পৃষ্ঠা নং- ১০৩ পৃ. মাকতুবায়ে থানবী, দেওবন্দ)। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা) মাহফিলে তাশরীফ আনয়ন করা ও উপস্থিত হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। উক্ত গ্রন্থটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব কৃত সত্যায়িত করা হয়েছিল। যা দেওবন্দ এর 'মাকতুবাতে থানবী' লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত। শুধু তাই নয় হাজী সাহেব আরও বলেন, "এ আক্বীদা ও বিশ্বাস রাখা যে, মিলাদ মাহফিলে হুযুর পুরনুর উপস্থিত হন, এটা 'কুফর' বা 'শিরক' নয়, বরং এমন বলা সীমালঙ্গন ছাড়া কিছুই নয়। কেননা এ বিষয়টি যুক্তিভিত্তিক ও শরীয়তের দলীলের আলোকে সম্ভব। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবে তা ঘটেও থাকে।" (আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী : কুল্লীয়াতে এমদাদীয়া, পৃ : ১০৩ মাকতুবাতে থানবী, দেওবন্দ, ভারত)

## ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে রোযা রাখা

ঈদে মীলাদুন্নবী (সা) মাহফিলের আয়োজন মোবারক হবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা। আমাদেরকে সেই রহমতের চাদরে ঢেকে নিবেন আশা করছি। হাদীস শরীফে সাহাবায়ে কেরাম সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেছেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– তোমাদের এখানে কিসে বসিয়েছে? তাঁরা বললেন– আমরা আল্লাহ্র স্মরণে এবং তিনি যে আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন এবং আপনাকে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যে ইহসান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– সত্যই কি তোমরা এইজন্য এখানে বসেছো? তাঁরা বললেন– আল্লাহ্র শপথ! আমরা এজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি।" তিনি

বললেন– আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের থেকে শপথ নেই নি বরং এইজন্য যে, জিব্‌রাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের উপর গৌরব করেছেন।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদীস নং ৫৪২৬)

অন্য একটি হাদীসের আলোকে জীবন গঠনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা যায়। বর্ণিত হয়েছে– হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা (রা) থেকে বর্ণিত– 'আমার সন্তান ইয়াস জন্মগ্রহণ করলে আমি নবী করীম (সা)-এর একদল সাহাবীকে দাওয়াত করে আহার করাই। তাঁরা দোয়া করলেন। আমি বললাম, আপনারা দোয়া করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের দোয়ার উসীলায় আপনাদেরকেও বরকত দান করুন। আমিও এখন কতগুলো দোয়া করবো এবং আপনারা আমীন বলবেন। রাবী বলেন, আমি তাঁর দ্বীনদারি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জন্য অনেক দোয়া করলাম। রাবী বলেন, আমি সেই দিনের দোয়ার প্রভাব লক্ষ্য করছি।' (আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১২৬৭)

## পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন উপলক্ষে ইমাম মুজতাহিদগণের অভিমতসমূহ

১. প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– 'যদি আমার উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত তাহলে আমি তা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈদ-ই-মিলাদুন্নাবী (সা) মাহফিলের জন্য খরচ করতাম'। [সূত্র : আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১১]

২. হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– 'যে ব্যক্তি ঈদ-ই-মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছে, সে ঈমানের সফলতা লাভ করেছে'। [সূত্র : আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১১]

৩. হযরত মারুফ কারখী (র) বলেন– 'যে ব্যক্তি ঈদ-ই-মিলাদুন্নাবী (সা) উপলক্ষে পানাহারের আয়োজন করে মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে, আলোকসজ্জা করে, নতুন পোষাক পরিধান করে এবং খুশবো, আতর, গোলাপ ও লোবান প্রয়োগে নিজেকে সুগন্ধিযুক্ত করে; রোজ কিয়ামতে প্রথম শ্রেণীর নবীদের সাথে তার হাশর হবে এবং ইল্লীঈনের সর্বোচ্চ স্থানে সে অবস্থান করবে'। [সূত্র : আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১১]

৪. শাফেঈ মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম শাফেঈ (র) বলেন যদি কোন ব্যক্তি ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে মুসলিম ভাইদেরকে খাবার তৈরি করে মজলিসে আপ্যায়ন করে ও ইবাদাত সম্পন্ন করে, রোজ কিয়ামতে সিদ্দীকিন, শাহাদা ও

সালেহীনদের সাথে তার হাশর হবে এবং জান্নাতুন নাঈমে সে অবস্থান করবে। [সূত্র : আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১৩]

৫. ৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র) বলেন, তিনি তার 'আল উয়াছায়েল ফী শরহিশ শামাইল' গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন, 'যে গৃহে বা মসজিদে কিংবা মহল্লায় মীলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে হুযুর (সা)-এর মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তখন অবশ্যই সে গৃহ বা মসজিদ বা মহল্লা অসংখ্য ফেরেশতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং উক্ত স্থান সমূহে যারা অবস্থান করে তাদের জন্য তারা সালাত পাঠ করে। (অর্থাৎ তাদের গুণাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সাধারণভাবে রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর নূরের মালা পরিহিত ফেরেশতাকূল বিশেষত হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল, ঈস্রাফীল ও আজরাঈল আলাইহিস সালাম মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে মাহফিল আয়েজনকারীর গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন'।

তিনি আরো বলেন, 'যে মুসলমানের গৃহে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মীলাদ পাঠ করা হয়, সে গৃহ ও গৃহে বসবাসকারী ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নি, পানি, পরনিন্দা, কুদৃষ্টি ও চুরি ইত্যাদির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে। সে ঘরে যার মৃত্যু হবে সে মৃত ব্যক্তি কবরে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর অতি সহজে দিতে পারবে। যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর মীলাদকে সম্মান করতে চায়, তার জন্য ইহাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নিকট নবী করীম (সা)-এর মীলাদের কোন মর্যাদা নেই, তার অন্তর এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, তার সামনে হুযুরপুর নূর (সা)-এর বিশ্বজোড়া প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হলেও তার অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বিন্দুমাত্র মুহাব্বতের উদ্রেক হবে না'। [সূত্র : আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১৩ ও ১৪]

৬. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তলানী (র) (মৃত্যু : ৯২৩ হিজরী) বলেন– 'যে ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাতসমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তার উপরে রহমত বর্ষণ করেন। আর উক্ত রাত্রকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করবে এ জন্য যে, যাদের অন্তরে (নবী বিদ্বেষী) রোগ রয়েছে। তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারণ করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে পুড়ে যায়'। [সূত্র : শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৬২]

৭. হযরত সাররী সাক্বত্বী (র) বলেন– 'যে ব্যক্তি মিলাদ শারীফ পাঠ বা মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করলো, সে যেন তার জন্য জান্নাতে রওজা বা বাগান নির্দিষ্ট করলো। কেননা সে তা হুজুর পাক (সা)-এর মহব্বতের জন্যই করেছে।' [সূত্র : আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ১৩]

৮. ক/ প্রায় ৫০০ বছরের প্রবীণ আলেম উপমহাদেশে যিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রচার-প্রসার করেছেন, ইমামুল মুফাসসিরীন ওয়াল মুহাদ্দিছীন ওয়াল ফুক্বাহা হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (র) বলেন– 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব নূরে মুজাসসাম, হুযূর পাক (সা) উনার বিলাদত শরীফের দিবসকে (অর্থাৎ মিলাদুন্নবীকে) তা'যীম করবে এবং সে উপলক্ষে ঈদ উদযাপন করবে সে চিরশান্তিময় জান্নাতের অধিকারী হবে।' [সূত্র : ইবনু নাবাতা, আল বাইয়্যিনাত ১৫৯/৩০)]

খ/ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) আরও বলেন– 'যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সা)-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন করে, তার উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন। আর যার মনে হিংসা এবং [নবী সা-এর দুশমনির] রোগ রয়েছে, তার ঐ (নবী বিদ্বেষী) রোগ আরও শক্ত আকার ধারণ করে'। [সূত্র : মা সাবাতা বিসসুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং-৮৬]

৯. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম যাহাবী (র) প্রায় ৬০০ বছর আগে মিলাদুন্নবী (সা)-এর মাহফিল এবং প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনকারী বাদশাহ মুজাফফর (র)-এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন এভাবে– 'মালিক মুজাফফর (র) এর দ্বারা আয়োজিত মীলাদুন্নবী (সা) এর মাহফিলের বর্ণনা দেওয়ার মত ভাষা নাই। আরব এবং ইরাক এর লোকেরা খুশির সাথে মাহফিলে যোগদান করত। তিনি একজন ধার্মীক সুন্নি ছিলেন এবং তিনি ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসগণকে অনেক ভালোবাসতেন।' (সুবাহানাল্লাহ) [সূত্র : ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ভলিউম ৪৫, পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৫ দার আল-কুতুব আল-আরাবি প্রকাশনী, বৈরুত/ লেবানন)]

১০. ভারত উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র) প্রায় ৩০০ বছর আগে নিজের রচিত 'ফুইউজুল হারামাইন' কিতাবের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আমি ইতিপূর্বে হযরতের আগমনের (মিলাদুন্নবীর) দিবসে মক্কা শরীফে উপস্থিত ছিলাম এবং লোকেরা নবী (সা)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন, তাঁর পয়দায়েশের সময় যে অলৌকিক

ঘটনাবলি প্রকাশিত হয়েছিল ও তাঁর নবুয়ত লাভের আগে যে সমস্ত ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছিল, সেসব উল্লেখ করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি কতগুলো নূর হঠাৎ প্রকাশিত হতে দেখলাম, আমি বলতে পারিনি যে, এ নূরগুলো চর্মচক্ষে দেখেছিলাম এবং ইহাও বলতে পারি না যে, এগুলো কেবলমাত্র অন্তরচক্ষুতে দেখেছিলাম। এই দুটোর মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার কী ছিল, তা আল্লাহপাকই সমধিক অবগত আছেন। তারপর আমি এই নূরগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে বুঝলাম যে, ফেরেশতাগণ এ প্রকারের ঘটনাবলী ও মজলিশসমূহের জন্য নিয়োজিত হয়েছেন, এগুলো তাঁদের নূর, আরো দেখতে পেলাম যে, ফেরেশতাগণের নূরগুলোর সাথে আল্লাহর রহমতের নূরগুলো মিলিত হচ্ছে।" [সূত্র : শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র) : 'ফুইউজুল হারামাইন', ৮০ পৃষ্ঠা]

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হল–

(ক) মক্কা শরীফে প্রতি বছর মুসলমানগণ মিলাদুন্নবী মাহফিল আয়োজন করে থাকেন।

(খ) শাহ ওলী উল্লহমুহাদ্দিসে দেহলভী (র) মক্কা শরীফে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে যোগদান করেছিলেন।

(গ) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) মিলাদুন্নবী মাহফিলকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। এ কারণেই তিনি মক্কা শরীফে আয়োজিত মিলাদুন্নবীর মাহফিলকে ত্যাগ করেননি।

(ঘ) মিলাদুন্নবীর মাহফিলে আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের নূর নাজিল হয়ে থাকে। (সুবাহানাল্লাহ)

১১. হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার' কিতাবে বর্ণিত আছে– 'রাতসমূহের মধ্যে উত্তম রাত হচ্ছে পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা)-এর রাত, অতঃপর লাইলাতুল কদরের রাত, অতঃপর মিরাজ শরীফের রাত, অতঃপর আরাফার রাত, অতঃপর জুমুয়ার রাত, অতঃপর ১৫ শাবানের রাত, অতঃপর ঈদের রাত।' [সূত্র : রদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার ৮/২৮৫ (শামেলা) (ফতোয়ায়ে শামী), পুরাতন ছাপা ৫০৫ পৃষ্ঠা]

উক্ত কওল শরীফ হানাফী মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব 'রদ্দুল মুহতার' বা 'ফতোয়ায়ে শামী'তে থাকার মাধ্যমে এটা মাযহাবের একজন নির্ভরযোগ্য ইমামের ফাতাওয়া হিসেবে সাব্যস্ত হচ্ছে। কাজেই কেউ হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলে তাকে এই ফাতাওয়া মানা কর্তব্য।

এখন যারা মীলাদুন্নবী (সা) উদযাপন করাকে শিরক, হারাম ও বিদয়াত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে থাকেন তারা উপরোক্ত মুহাদ্দীসের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন ।

তাদের ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে অবদান না থাকলে, আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান আলেমগণ হাদীস কি শাস্ত্র তাও চিনতেন না। [সূত্রঃ 'তাওয়ারীখ-ই হাবীব-ই ইলাহ্']

'এ তারিখেই সমস্ত শহরে মুসলমানদের 'জশনে মিলাদ' উদযাপনের নিয়ম রয়েছে।' [সূত্র : সীরাতে হালবিয়্যাহ ১ম খণ্ড ঃ ৯৩ পৃ, 'যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব' : ১ম খণ্ড : ১৩২ পৃষ্ঠা]

**প্রাচীন যুগের মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

মুহাদ্দিস ইবনুল জওযী (ওফাত : ৫৯৭ হি.) বলেছেন, "হারামাঈন শরীফাঈন (মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ), মিশর, সিরিয়া, সমস্ত আরব দেশ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানদের মধ্যে পুরানা যুগ থেকে এ নিয়মই চলে এসেছে যে, রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখতেই তাঁরা মিলাদ শরীফের মাহফিলসমূহ আয়োজন করতেন, খুশি উদযাপন করতেন, গোসল করতেন, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করতেন, বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা করতেন, খুশবু লাগাতেন, এ দিনগুলোতে (রবিউল আউয়াল) খুব খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করতেন, সামর্থ্যানুসারে লোকজনের জন্য টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র খরচ করতেন এবং মিলাদ শরীফ পাঠ ও শ্রবণের প্রতি পূর্ণাঙ্গ গুরুত্ব দিতেন। এরই মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান ও মহা সাফল্যাদি অর্জন করতেন।

মিলাদ শরীফের খুশি উদযাপনের পরীক্ষিত বিষয়াদির উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– গোটা বছর অধিক পরিমাণে কল্যাণ ও বরকত, সুখ ও শান্তি, জীবিকা, মাল-দৌলত এবং আওলাদে আধিক্য লাভ হয়। আর শহরগুলোতে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এবং ঘর-বাড়িতে অনাবিল শান্তি জশনে মিলাদুন্নবী (সা)-এরই বরকতে বিরাজমান থাকে।" [সূত্রঃ 'বয়ানুল মীলাদিন্নবভী', কৃত. ইবনে জূযী : ৫৭ ও ৫৮ পৃ.]

ইমাম আহমদ ক্বাস্তলানী (র) বলেছেন– "আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য রহমত নাযিল করুন ওই ব্যক্তির উপর, যে মিলাদ-ই পাকের মাস রবিউল আউয়াল-এর রাতগুলোকে ঈদের এমন খুশির রাতে পরিণত করে যে, যার অন্তরে শানে রেসালতের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের রোগ-ব্যাধি রয়েছে তার অন্তরের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়।" [সূত্র : 'আল-মাওয়াহিব' যারক্বানীসহ ১ম খ ১৩৯ পৃ.]

মোল্লা আলী ক্বারী (ওফাত ১০১৪ হি.) হানাফী (র) বলেছেন– 'মক্কাবাসীগণ মীলাদুন্নবী (সা) শরীফের প্রতি গুরুত্ব ঈদ অপেক্ষাও বেশি দিতেন।' [সূত্রঃ 'আল-মাওরেদ-আর রাভী', মক্কা মুকাররা মাহ্য মুদ্রিতঃ ২৮ পৃ.]

**শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর পর্যবেক্ষণ**

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেছেন, "আমি একবার মক্কা মু'আয্যমায় মীলাদুন্নবী (সা)-এর পবিত্র জন্মের স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন লোকেরা হুযূরের ওই সব মু'জিযা বর্ণনা করছিলেন, যেগুলো হুযূরের শুভাগমনের পূর্বে ও হুযূরের নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে প্রকাশ পেয়েছিলো। তখন আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম– সেখানে জ্যোতিসমূহেরই ছড়াছড়ি। তখন আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম ও বুঝতে পারলাম, ওই 'নূর' (জ্যোতি) হচ্ছে- ওইসব ফিরিশতারই, যাঁদেরকে এমন মাহফিলসমূহের (মীলাদ শরীফ ইত্যাদি) জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে। অনুরূপ, আমি দেখেছি 'রহমতের নূর' ও 'ফিরিশ্তাদের নূর' সেখানে মিলিত হয়েছে।" [সূত্র : 'ফুয়ূযুল হেরমাঈন', আরবী-উর্দু : ৮০-৮১পৃ.]

শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী আলেম হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজির-ই মক্কী সাহেব বলেছেন, 'মওলেদ শরীফ (মীলাদুন্নবী সা) সমস্ত হারামাঈন শরীফাঈনবাসীই উদযাপন করেন। আমাদের জন্য এতটুকু দলীলই যথেষ্ট।' [সূত্র : 'আশ্শাম-ই ইমদাদিয়াহ ৪৭ পৃ.]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর পুত্রের ফাতাওয়া শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী লিখেছেন– 'কট্টর কাফির আবূ লাহাব নবী করীম (সা)-এর বেলাদতের খুশিতে তার ক্রীতদাসী সুয়ায়বাহকে আযাদ করার ফলে সে কবরে প্রতি সোমবার (বেলাদত শরীফের দিন) শান্তিদায়ক পানীয় (শোষণ) করার জন্য পেয়ে থাকে। সুতরাং ওই একত্ববাদী মুসলমানরা কত বড় নিয়ামত পাবে (অর্থাৎ সে কী কী নি'মাত লাভ করবে), যে মীলাদুন্নবী (সা)-এর খুশী উদ্যাপন করে থাকে!' [সূত্র : 'মুখতাসার সীরাতুর রসূল' ১৩ পৃষ্ঠা, হাফেয আবদুল গফূর আহলে হাদীস, ঝীলাম কর্তৃক প্রকাশিত]

সুতরাং এই কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, ১২ রবিউল আউয়াল শরীফ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই মহান দিবস। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল করারও তৌফিক দিন! আমীন! ♦

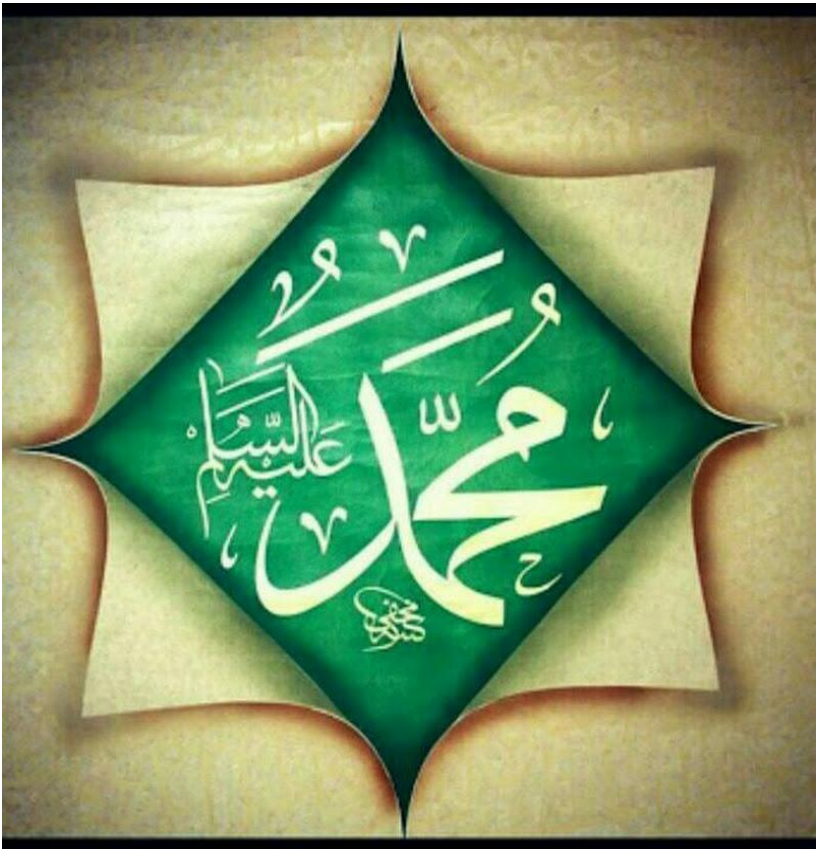


# রাসূল (সা)-এর দৈনন্দিন রুটিন

## যেভাবে কাটতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিন-রাত

**মিরাজ রহমান/ শাহ মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ**

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের জীবনের ভেতরেই রয়েছে অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ও রহমত হিসেবে ধরাতে

প্রেরণ করেছেন মহান আল্লাহ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা মুহাম্মাদের ৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন, হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট কোরো না। এছাড়া মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতে আরও ইরশাদ করেছেন, রাসূল তোমাদের যা দেন; তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন; তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

বুখারির ২৯৫৭ হাদিসে এবং মুসলিমের ১৮৩৫ নং হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমিরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে যে কথাটি বুঝা যায় সেটি হলো– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা এবং তাঁর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই দুনিয়ার হেদায়েত ও পরকালের নাজাত নিহিত রয়েছে। রাসূল (সা)-এর সুন্নাতি-আমলগুলো অনুসরণে প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূল (সা)-এর প্রকৃত অনুসারী হতে হলে তার দৈনন্দিন জীবনধারায় যেসব সুন্নাত-আমল রয়েছে তা আমাদের জানা উচিত এবং অনুসরণ করা উচিত। নিম্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন আমলের সহিহ হাদিসভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

### এক : রাতের শেষ প্রহরের আমল

**১. শেষরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষরাতে জাগ্রত হতেন।[১]

**২. ঘুম থেকে উঠার দোআ পাঠ করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের শেষপ্রহরে ঘুম থেকে উঠে দোআ পড়তেন। এ সময় বেশ কয়েকটি দোআ পাঠের অভ্যাস ছিল তাঁর। তন্মধ্যে একটি দোআ হলো–

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে (ঘুমের মাধ্যমে) মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং একমাত্র তাঁর কাছেই আমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[২]

**৩. মিসওয়াক করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিরাতে ঘুম থেকে জেগে গুরুত্ব সহকারে মিসওয়াক করতেন। হযরত হুজাইফা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন মিসওয়াক করতেন।[৩]

**৪. ইসতেঞ্জার স্থানে প্রবেশের শুরুতে ও বের হওয়ার সময় দোআ পড়তেন**

ইসতেঞ্জার স্থানে প্রবেশ করার সময় রাসূল (সা) দোআ পড়তেন। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নির্লজ্জ শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।[৪]

ইসতেঞ্জার স্থান থেকে বের হওয়ার সময়ও একটি দোআ পড়তেন রাসূল (সা)। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।[৫]

**৫. গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন**

শেষরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন। কখনো কখনো ফজরের নামাযের আগেও গোসল সেরে নিতেন। হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, কখনো কখনো মসজিদে আসার সময় দেখা যেত তার চুল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে ভিজিয়ে দিত কাঁধ মোবারক।[৬]

**৬. অজু করতেন**

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষ ঘুমানোর পর শয়তান মানুষের ঘাড়ে তিনটি গিট্টু দেয়। ঘুম থেকে জাগার পর আল্লাহ তাআলার নাম নিলে একটি গিট্টু খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি খুলে যায়; নামায পড়ার পর আরেকটি খুলে যায়।[৭]

**৭. অজুর শুরুতে, মধ্যখানে ও শেষে দোআ পড়তেন**

অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেন, অজুর শুরুতে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিবে না, তার অজু পরিপূর্ণ হবে না।[৮] অজুর মধ্যখানে একটি দোআ পড়তেন রাসূল (সা)। দোআটি হলো– অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমার ঘর প্রশস্ত করে দিন, আমার রিজিক প্রশস্ত করে দিন।[৯] অজুর শেষেও একটি দোআ পড়তেন রাসূল (সা)। দোআটি হলো–অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তার কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অজু শেষে যারা এ দোআ পাঠ করবে, তাদের জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে।[১০]

**৮. ইবাদতের পরিবেশ তৈরি করতে দোআ ও জিকির করতেন**

ইবাদতের একটি আবশে তৈরি করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ দোআ ও জিকির করতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, জাগ্রত হয়ে তিনি ১০ বার করে এই শব্দগুলো বলতেন, আল্লাহু আকবার; আলহামদুলিল্লাহ; সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস; আসতাগফিরুল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এরপর তিনি ১০ বার এই দোআটি পড়তেন–

অর্থ : প্রভু মোর! এই দুনিয়ার সংকীর্ণতা আর পুনরুত্থান দিবসের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার চাই।[১১]

**৯. তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং তিনি উম্মাহকে তাহাজ্জুদ পড়ার উৎসাহমূলক আদেশও করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। কখনো ৪ রাকাত, কখনো ৬ রাকাত, কখনো কখনো ৮ রাকাত পড়তেন।[১২]

**১০. তাহাজ্জুদ নামাযে লম্বা কিরআত পড়াবস্থায় কাঁদতেন এবং রুকু-সিজদাহ দীর্ঘ হতো**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একদিন তাহাজ্জুদের নামায পড়ি। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, আমি বসে পড়ার নিয়ত করেছিলাম।[১৩]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদে এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত।[১৪] হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন, একেকটি সিজদা হতো, কুরআনে কারিমের ৫০ আয়াত পড়া যায় সমান দীর্ঘ।[১৫] যতক্ষণ দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন, তাঁর রুকুও যেন ততক্ষণ হতো।[১৬]

**১১. দোআ-মোনাজাতে কায়মানুবদনে কান্না-কাটি করতেন**

শেষরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোআ-মোনাজাত ও রোনাজারির বর্ণনা বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। এ সময় তিনি বিভিন্ন দোআ করতেন এবং কান্না-কাটি করতেন।[১৭]

**১২. বিতিরের নামায আদায় করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকাত বিতির পড়তেন। একসাথে পড়বেন বলে স্ত্রীকে জাগিয়ে তুলতেন। প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। কখনো কখনো সূরা ফালাক ও নাসও পড়তেন।[১৮]

**১৩. বিতিরের নামাযের পর দোআ পড়তেন**

বিতিরের নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোআ পড়তেন। বিতির শেষে তিনবার বলতেন,

অর্থ : মহামালিক মহাপবিত্র সত্তার জন্য মহিমা। তৃতীয়বার একটু টেনে লম্বা করে দোআটি পড়তেন।[১৯]

**১৪. তাহাজ্জুদের সময় কবর জিয়ারত করতেন**

জীবনের শেষ দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে যেতেন এবং মৃতদের জন্য দোআ করতেন। তাঁর এ ঘটনার সাক্ষী হযরত আয়েশা (রা)। তিনি বলেন, প্রতি রাতের শেষ দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে যেতেন এবং দোআয় বলতেন, মুমিন নিবাসীদের এই জায়গায় আসসালামু আলাইকুম। তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তোমরা তা পেয়েছ। অপেক্ষা করছো আগামী দিনের। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও আসবো। হে আল্লাহ জান্নাতুল বাকি গারকাদের লোকজনকে ক্ষমা করে দিন।[২০]

**১৫. হযরত ফাতেমা** রাদিআল্লাহ তায়লা আনহার **বাসায় যেতেন, তাদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য ডেকে দিতেন**

কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর বাসায় যেতেন এবং তাদেরকে তাহাজ্জুদের নামাযের

জন্য ডেকে তুলতেন। তাদের ডেকে বলতেন, ওঠো! নামায পড়বে না তোমরা?[২১]

**১৬. সাওম পালনের নিয়ত থাকলে সাহরি খেতেন**

রমযান মাসে অথবা বছরের অন্য যে কোনো মাসের যে কোনো দিনে সাওম পালনের নিয়ত থাকলে এ সময় সাহরি খেতেন রাসূল (সা)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা সাহরি খাও, কারণ, সাহরিতে বরকত রয়েছে।[২২] তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি রোযা পালনের নিয়ত করেছে, সে অল্প করে হলেও যেন সাহরি খায়।[২৩] অন্য বর্ণনা মতে, এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও যেন সাহরি করে।[২৪]

**দুই : সুবহে সাদিকের সময়ের আমল**

**১. আযানের উত্তর দিতেন**

মুয়াজ্জিনের প্রতিটি কথার পুনরাবৃত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযানের উত্তর দিতেন।[২৫]

**২. আযানের উত্তর দেওয়ার পর দোআ পড়তেন**

আজানের উত্তর দেওয়া শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোআ পড়তেন। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ আপনি এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিন জান্নাতের সেই বিশেষ স্তর ও মর্যাদা। যে প্রশংসিত স্থানের প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন, তাঁকে পৌঁছে দিন সেখানে।[২৬]

**৩. ঘরে দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামায সংক্ষেপে আদায় করতেন**

সংক্ষেপে দু রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই ২ রাকাত নামায যত সংক্ষেপ করতেন, অন্য কোনো নামায এতো সংক্ষেপ করতেন না। অন্যরা ভাবতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হয়তো সূরা ফাতিহাই পড়েননি।[২৭] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু রাকাত নামায আদায় করতেন, কখনো তা ছাড়েননি।[২৮]

**৪. ফজরের নামাযের আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন অথবা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন**

স্ত্রী ঘুম থেকে জেগে উঠলে সুন্নাত শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে খোশ আলাপ করতেন। আর স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকলে তিনি ডান কাতে একটু বিশ্রাম নিতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ফজরের দু রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ ডানকাতে শুয়ে থাকতেন।[২৯]

**৫. ফজরের সুন্নাত নামাযের পর দোআ পড়তেন**

ফজরের সুন্নাত নামাযের পর পর একটি দোআ পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ আপনি জিবরাঈল (আ), ইসরাফিল (আ) মিকাঈল (আ) ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রভু; আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ/পানাহ চাচ্ছি।[৩০]

**৬. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দোআ পড়তেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দোআ পড়তেন। দোআটি হলো–

অর্থ : আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া অকল্যাণরোধ বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারও নেই।[৩০]

এছাড়া এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একটি দোআ পড়তেন। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি আসমান, জমিন ও মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। সকল প্রশংসা আপনার জন্য; আপনি আসমান, জমিন ও মধ্যবর্তী সবকিছুর কাইয়্যুম। সকল প্রশংসা আপনার জন্য; আসমান, জমিন ও মধ্যবর্তী সবকিছুর নূর। আপনি সত্যবাদী। আপনার কথা সত্য। আপনার অঙ্গীকার সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীরা সবাই সত্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী। হে আল্লাহ! আপনার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আপনার উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আপনার উপর ভরসা করেছি। আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। সকল বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। আমার আগের পিছের, গোপন-প্রকাশ্য সকল অপরাধ

ক্ষমা করে দিন। আপনি আমার প্রভু! আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই।[৩১]

**৭. দোআ পড়ে ডান পা দিয়ে দরুদ পড়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন আমার উপর সালাম পাঠ করে এবং দোআ পড়ে। মসজিদে প্রবেশ করার দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।[৩২]

**৮. কাতারে দাঁড়িয়ে দেখে নিতেন কাতার সোজা আছে কিনা**

নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে নিতেন, সবাই কাতার সোজা করেছে কিনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, কাতার সোজা করো। ঘেঁষে ঘেঁসে দাঁড়াও। কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অংশ।[৩৩]

**৯. জামাতে ফজরের নামায আদায় করতেন এবং তিনি ইমামতি করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে ফজরের নামায আদায় করতেন এবং তিনি জামাতের ইমামতি করতেন। হযরত আবু বারজা আসলামি (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে ৬০ আয়াত থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পড়তেন।[৩৪] কখনো সূরায়ে 'ক্বাফ' পড়তেন।[৩৫]

**১০. পরিস্থিতি-প্রয়োজন হলে ফজরের নামাযে কুনুতে নাজেলা পড়তেন**

কখনো মুসলিমরা দূর্বিপাকে পড়লে, কোনো ভয়ানক সঙ্কট দেখা দিলে ফজরের ফরজ নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে উঠে দোআ করতেন। এই দুর্যোগ-বিপদ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ মহানের কাছে কাতর স্বরে অনুনয় করতেন। যে দোআকে পরিভাষায় কুনুতে নাজেলা বলা হয়।[৩৬]

**তিন : ফজরের নামাযের পরের আমল**

**১. ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত ও বিভিন্ন দোআ-মামুলাত আদায় করতেন**

ফজরের নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বেশ কিছু দোআ-মামুলাত আদায় করতেন।[৩৭]

**২. ফজরের নামাযের পর ঘুরে বসে সাহাবীদের সময় দিতেন**

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের খোঁজ-খবর নিতেন। কুশল বিনিময় করতেন। নামাযে অনুপস্থিতদের কথা জানতে চাইতেন। কেউ অসুস্থ থাকলে দেখতে যেতেন। কোনো জানাযা আছে কিনা জানতে

চাইতেন। এছাড়া এ সময় তিনি সাহাবীদের দেখা বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন। কোনোদিন এমন হতো কারো কোনো স্বপ্ন না থাকলে নিজের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনাতেন।[৩৮]

**৩. ফজরের নামাযের পর ঘুমানোর অভ্যাস ছিল না তাঁর**

ফজর পরে দিনের শুরুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়েছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং এ সময়ে উম্মতের কাজে বরকতের দোআ করেছেন তিনি।[৩৯]

**৪. সূর্যদয়ের সময় দোআ পাঠ করতেন**

সূর্যদয়ের সময় দোআ পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দোআটি হলো–

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে এই দিনটি দান করেছে এবং আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করেছেন।[৪০]

**৫. ইশরাকের নামায আদায় করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর ইশরাকের দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। রাসূল (সা) বলেছেন, ফজরের নামায জামাতে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত যারা আল্লাহ তাআলার জিকির-আজকার, দোআ-মামুলাত আদায়ে ব্যস্ত থাকবে, তারপর দু রাকাত নামায আদায় করবে; তারা পরিপূর্ণ হজ ও উমরার সাওয়াব পাবে।[৪১]

হযরত আবু দারদা ও আবু জর গিফারি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনি আদম! দিনের শুরুতে আমার জন্য ৪ রাকাত নামায পড়, দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার যাবতীয় কাজের জন্য আমি যথেষ্ট হব।[৪২]

**৬. দোআ পড়ে বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হতেন**

মসজিদ থেকে বাম পা দিয়ে দোআ পড়ে বের হতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যে দোআটি তিনি এ সময় পড়তেন সেটা হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করি।[৪৩]

**৭. পানিভর্তি পাত্রে আঙুল চুবিয়ে বরকতময় করতেন**

মদীনার বিভিন্ন স্থান থেকে দাস-দাসীসহ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পানিভর্তি পাত্র নিয়ে জড়ো হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুরোধে প্রতিটি পাত্রের খাবার পানিতে পবিত্র আঙুল মোবারক চুবিয়ে বরকতময় করতেন।[৪৪]

**৮. স্ত্রীদের ঘরে যেতেন এবং ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে সালাম দিতেন**

সূর্য যখন দিগন্তরেখা ছেড়ে মাথা তুলে কিছু দূর উঠতো, তখন স্ত্রীদের ঘরে যাওয়ার জন্য উঠতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৪৫] ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে সালাম দিতেন এবং কুশল বিনিময় করতেন। খুব বেশি সময় তিনি কারো ঘরেই থাকতেন না।[৪৬] কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখতেন তিনি এখনও মুসাল্লায় রয়েছেন, তাকে তার অবস্থায় থাকতে দিতেন।[৪৭]

## চার : দিনের প্রথম ভাগের আমল

### ১. নাশতা করতেন

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খেজুর ভিজিয়ে রাখতাম, সকালে তিনি তা খেতেন।[৪৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত মধু, দুধ, পনির, খেজুর, হাইস– (খেজুর, কিশমিশ ও মধু মিশানো একপ্রকার বিশেষ পানীয়) ইত্যাদি দিয়ে সকালের নাশতা করতেন।[৪৯]

### ২. খাবার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিতেন

খাবার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিতেন রাসূল (সা)। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল নাপাক হলে খাওয়া অথবা পান করার আগে উভয় হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর খেতেন অথবা পান করতেন।[৫০]

### ৩. ঘরে খাওয়ার কিছু না থাকলে সাওম পালনের নিয়ত করতেন

ঘরে খাওয়ার মতো কিছু না থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, তা হলে আজ আমি রোযা রাখছি।[৫১]

### ৪. পুনরায় মসজিদে নববীতে আসতেন এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়তেন

স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর আবার মসজিদে নববীতে চলে আসতেন রাসূল (সা)। নবীজির মসজিদে মুহাজির খুঁটি নামে একটি খুঁটি ছিল। এর পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করতেন তিনি। নফল নামাযগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এখানেই পড়তেন।[৫২]

### ৫. সাহাবিদের সময় দিতেন

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথা বলতেন, তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন।[৫৩] পরামর্শ সভায় বসতেন।[৫৪] দ্বীনি আলোচনায় মুখরিত হতো চারপাশ।[৫৫]

### ৬. অগণিতবার ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন

দ্বীনি আলোচনা সভা বা মজলিশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগণিতবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। সাহাবিরা খেয়াল করে দেখেছেন, রাসূল (সা) সব সময় অনুশোচনা করছেন। ক্ষমা চাইছেন। তারা কখনো গুণেও দেখেছেন একই মজলিশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০০ বার পড়েছেন–

অর্থ : হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করুন। আমার অনুশোচনা কবুল করুন। কেবল আপনিই তাওবা কবুলকারী এবং অতি দয়ালু।[৫৬]

**৭. মসজিদে অবস্থানকালে নবজাতক শিশুদের তাহনিক ও নামকরণ করতেন**

সকালে মসজিদে বসাবস্থায় নবজাতক শিশুদের নিয়ে আসা হলে রাসূল (সা) তাদের দোআ করে দিতেন। খেজুর চিবিয়ে নরম করে বাচ্চার মাড়িতে আলতোভাবে ডলে দিতেন। এটাকে পরিভাষায় তাহনিক বলা হয়। তারপর তার নাম ঠিক করে দিয়ে বরকতের দোআ করতেন।[৫৭]

**৮. মসজিদের আলোচনা সভায় কখনো কখনো খাওয়া-দাওয়া করতেন**

মসজিদে আলোচনা সভা চলাকালে বিভিন্ন খাবার আসতো। হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। একথালা সারিদ এলো। উপস্থিত সবাই মিলে খেলাম।[৫৮] একবার খেঁজুরের রসভর্তি পাত্র এলো।[৫৯] এছাড়া খেজুর গাছগুলোতে যখন প্রথম ফল ধরতো; লোকজন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া পাঠাত। রাসূল (সা) শিশু-বাচ্চাসহ সবাইকে নিয়ে তা খেতেন এবং তখন দোআ করতেন।[৬০]

**৯. বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন**

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর-দূরান্ত থেকে আসা বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করতেন। কথাবার্তা বলতেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করতেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও করতেন।[৬১]

**১০. বড় বড় সিদ্ধান্তের আগে এ সময় পরামর্শ করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় কোনো ঘটনা বা সিদ্ধান্তের আগে এ সময় পরামর্শ করতেন। উহুদের যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ সময়ের এক পরামর্শ সভাতেই গৃহীত হয়। ইহুদি ও কাফেরদের হামলা থেকে মদীনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পরিখা (খন্দক) খননের সিদ্ধান্তও এ সময়ের বৈঠক থেকে নেওয়া হয়েছিল।[৬২]

**১১. মজলিস-সভা শেষে দোআ পড়তেন**

মসলিশ শেষে দোআ পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেউ একজন তার দোআ পড়া শুনে বললেন, এমন কথা তো আগে শুনিনি আপনার মুখে?। রাসূল (সা) তখন বললেন, মজলিশে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে গেলে এই শব্দগুলো তা মিটিয়ে দেয়।[৬৩]

দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

**১২. আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিতেন**

সকালবেলা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে যেতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত ফাতেমা (রা)-এর বাসায় যেতেন প্রায়শই। হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসাইন (রা)-এর সাথে দেখা করতেন ও মেয়ের খোঁজ–খবর নিতেন। একদিন এসময় হযরত ফাতেমা (রা)-এর বাসায় গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আমি হাসানকে ভালোবাসি, আপনিও তাঁকে ভালোবাসুন এবং যারা হাসানকে ভালোবাসে, তাঁকেও ভালোবাসুন।[৬৪]

**১৩. অন্যন্য সাহাবায়ে কেরামের বাসায়ও দাওয়াতে যেতেন**

অনেকের আগ্রহ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তার বাসায় যান। রাসূল (সা) খোঁজ নিয়ে নিজেই তাদের বাসায় হাজির হয়ে যেতেন। হযরত আনাস (রা)-এর আম্মা উম্মে সুলাইম রাদিআল্লাহ তায়লা আনহুর বাসায় গিয়েছেন।[৬৫]

একদিন এক দর্জির বাসায়ও গিয়েছেন তার দাওয়াতে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জব, লাউ ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করেছেন।[৬৬]

দাওয়াতকারীদের সঙ্গে খোশমেজাজে কথাবার্তা বলতেন রাসূল (সা)। এমনকি ছোট শিশু-বাচ্চাদের মাঝেও ছড়িয়ে যেত তার হৃদ্যতা। হযরত আনাস (রা) বলেন, আচার-আচরণে তিনি ছিলেন সবার সেরা।[৬৭] কারো বাড়িতে দাওয়াত খেলে অবশ্যই তাদের জন্য দোআ করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৬৮]

**১৪. রোগী দেখতে যেতেন**

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আমল। তাঁর উপস্থিতি ছিল রোগীদের জন্য টনিকের মতো। অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে এ বিষয়ে। হযরত সাদ ইবনে উবাদাকে (রা) দেখতে যাওয়ার ঘটনা প্রসিদ্ধ।[৬৯] হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) অসুস্থ হলে তাঁকেও দেখতে যান।[৭০]

**১৫. বাজারে যেতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো বাজারেও যেতেন। সাহাবায়ে কেরামকে ব্যবসার মাসআলা-মাসায়িল ও ব্যবসার আদব বলতেন। সততা ও আমানতের সাথে ব্যবসা করার উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসূল (সা) বলেন, সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী রোজ কিয়ামতে নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহিদগণের সাথে থাকবে।[৭১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বিক্রেতা ও ক্রেতা যদি ব্যবসার সময় সত্য কথা বলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যবসায় বরকত দিবেন আর যদি তাদের কোনো একজনও কিছু গোপন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা বরকত নষ্ট করে দিবেন।[৭২]

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ফয়সালার সময় বদান্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন।[৭৩]

**১৬. দেখা-সাক্ষাতে হাসিমুখে সালাম-মুসাফাহা করতেন**

পথিমধ্যে যার সাথে দেখা হতো সালাম দিতেন, মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলতেন রাসূল (সা)। হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যখনই আমার দেখা হতো, মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলতেন।[৭৪] সাহাবিদের সঙ্গে দেখা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম সালাম জানাতেন। মুসাফাহা করে তার জন্য দোআ করতেন। অন্যজন হাত না ছাড়লে তিনি হাত ছাড়াতেন না।[৭৫]

**১৭. অন্যদের কাজে সহযোগিতা করতেন**

চলার পথে কাউকে কোনো কাজ করতে দেখলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে থেকে গিয়ে কাজে সহযোগিতা করতেন। একদিন পথিমধ্যে দেখলেন এক যুবক ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছে। কিন্তু কাজটা সে ঠিকমতো করতে পারছে না। রাসূল (সা) সেটা দেখে এগিয়ে গিয়ে বললেন, একটু সরো। তোমাকে দেখাই কীভাবে কাজটা করতে হয়। এরপর তিনি চামড়া ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, এভাবে কাজটা করতে হয়। ভালোভাবে কাজটা করা দেখিয়ে চলে গেলেন রাসূল (সা)।[৭৬]

**১৮. কারো বাড়িতে গেলে সালাম দিতেন, সাড়া না পেলে ফিরে আসতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারো বাড়িতে যেতেন দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না। ডানে বা বামে ঘুরে দাঁড়াতেন। দাঁড়িয়ে ৩ বার সালাম দিতেন। সালামের উত্তর না পেলে ফিরে আসতেন।[৭৭]

**১৯. কখনো কখনো মদীনার বাগানে বেড়াতে যেতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় মাঝে মাঝে মদীনার ফলবাগানগুলোতে যেতেন। হযরত আবু তালহা আনসারি (রা)-এর বায়রুহা নামে একটা বাগান ছিল। রাসূল (সা) সেখানে গিয়ে গাছগাছালির ছায়ায় নিজেকে এলিয়ে দিতেন। পান করতেন নিটোল পানিও।[৭৮]

**২০. সপ্তাহে একদিন মসজিদে কুবায় যেতেন**

সপ্তাহে একদিন দুপুরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবায় যেতেন। কুবার 'আরিস কুয়া'য় যেতেন তিনি।[৭৯] সেখানের লোকদের সাথে দেখা করতেন, তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।[৮০] সেদিন দুপুরের কাইলুলা উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর বাসায় করতেন।[৮১]

## পাঁচ : দিনের মধ্যভাগের আমল

**১. বাহিরের কাজ সেরে বাসায় ফিরতেন**

বাহিরের কাজ সেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু (সা) ঐ দিনটি যে স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করেছেন, সে স্ত্রীর বাসায় যেতেন। বাসায় প্রবেশ করে সালাম করতেন এবং মিসওয়াক করতেন।[৮২] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহির থেকে বাসায় প্রবেশ করে আগে মিওয়াক করতেন।[৮৩]

**২. নামাজুত দোহা (চাশত) আদায় করতেন**

এ সময় বাসায় ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকাত নামাজুত দোহা আদায় করতেন। কখনো কখনো ৬ রাকাত আবার কখনো ৮ রাকাতও পড়তেন।[৮৪]

**৩. নারীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান করতেন**

এ সময় বাসায় অবস্থালকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী সাহাবীয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও বিভিন্ন সমস্যার শরয়ী সমাধান প্রদান করতেন।[৮৫]

**৪. দুপরের খাবার খেতেন**

দুপুরের খাবারের জন্য বিশেষ কোনো চিন্তা ও ব্যবস্থাপনা রাসূল (সা) করতেন না। যখন যা পেতেন, তাই খেয়ে নিতেন। কখনো গোশত, কখনো দুধ, কখনো পনির ইত্যাদিও দুপুরের খাবারে খেতেন।[৮৬] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের জন্য কিছু হাদিয়া এসেছে। আমি আপনার জন্য কিছু রেখে দিয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কী? আয়েশা (রা) বললেন, হাইস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিয়ে এসো। হযরত আয়েশা (রা) নিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেলেন এবং বললেন, আমি রোযা পালন করে দিন শুরু করেছিলাম।[৮৭]

**৫. দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। দুপুরের বিশ্রামকে আরবী পরিভাষায় 'কাইলুলা' বলা হয়। সাধারণত, যে স্ত্রীর ঘরে সেদিন থাকার কথা, তাঁর ঘরেই তিনি কাইলুলা করতেন।[৮৮]

**৬. বিশেষ প্রয়োজনে অন্য কেউ বা কোনো সাহাবী এলেও তাদের সময় দিতেন**

এ সময় বিভিন্নজন আসতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও প্রয়োজন পূরণ করতেন। একদিন হযরত আবু বকর (রা) এলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হযরত আয়েশা (রা) বাসায় বিশ্রামে ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) এলেন, রাসূল (সা) তাঁরও প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর হযরত উসমান (রা) এলেন।[৮৯]

**৭. খাবারের শুরুতে ও শেষে দোআ পড়তেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের শুরুতে ও শেষে দোআ পড়তেন। খাবারের শুরুতে যে দোআটি পড়তেন সেটি হলো–

অর্থ : আল্লাহর নামে ও তাঁর বরকতের প্রত্যাশায়।[৯০]

আর খাবারের শেষে যে দোআটি পড়তেন সেটি হলো–

অর্থ : সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।[৯১]

কোথাও দাওয়াত খেলে তখন খাবারের শেষে যে দোআটি পড়তেন সেটি হলো–

অর্থ : নেক মানুষ তোমার খানা ভক্ষণ করুক, ফেরেশতারা বরকতের দোআ করুক এবং রোযাদার মানুষ ইফতার করুক।[৯২]

**৮. যোহরের আযান হলে কাইলুলা ত্যাগ করে ৪ রাকাত সুন্নাত বাসায় আদায় করতেন**

যোহরের আযান হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাইলুলা ত্যাগ করে আযানের উত্তর দিতেন। অজুর প্রয়োজন হলে অজু করে বাসায় যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন।[৯৩]

**৯. নামায আদায় করতে যাওয়ার সময় কখনো কখনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন**

নামায আদায় করতে যাওয়ার সময় কখনো কখনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৯৪]

**১০. জামাতে যোহরের নামায আদায় করতেন এবং ইমামতি করতেন**

মসজিদে গিয়ে সময় হওয়ার শুরু দিকে যোহরের নামায আদায় করতেন এবং তিনিই ইমামতি করতেন। কখনো কখনো যোহরের নামাযের সিজদা অনেক দীর্ঘ করতেন।[৯৫] ফরজের প্রথম দু রাকাতে সাধারণত ত্রিশ আয়াত তেলাওয়াত করতেন, কখনো আরও অনেক দীর্ঘও করতেন।[৯৬]

**১১. যোহরের পর কিছু দ্বীনি তালিমে ব্যস্ত থাকতেন**

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করতেন। মসজিদে অনেক সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হতেন। হাদিস শরিফে রাসূল (সা)-এর এ সময়ের বিভিন্ন বয়ানের বর্ণনা রয়েছে।[৯৭] তারপর বাসায় এসে দু রাকাত সুন্নাহ আদায় করতেন।[৯৮] তারপর আবার সাহাবায়ে কেরামের জন্য সময় দিতেন। যেমন, বনি আবদে কায়সের জন্য তিনি একদিন আসর পর্যন্ত সময় দিয়েছেন।[৯৯]

**১২. গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিচার/ফয়সালা করতেন**

গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলোচনা বা বিচার-ফয়সালা থাকলে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যোহরের নামাযের পর সেটা করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কের জন্য মাইজ আসলামি (রা)-কে যোহরের পর শাস্তি দিয়েছিলেন।[১০০]

**১৩. বাড়িতে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন**

মসজিদের প্রয়োজন সেরে বাসায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পরবর্তী দুই রাকাত সুন্নাত নামায পড়তেন।[১০১]

**১৪. সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজনে ছুটে যেতেন**

কখনো কখনো এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে অবস্থান করতেন আবার কখনো কখনো সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে ছুটে যেতেন। একবার খবর পেলেন আমর ইবনে আওস গোত্রের লোকজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছে। একে অন্যকে পাথর ছুড়েছে। রাসূল (সা) বেশ কয়েকজন সাহাবিকে বললেন, চলো গিয়ে ওদের শান্তির ব্যবস্থা করে আসি।[১০২]

**ছয় : দিনের শেষ ভাগের আমল (আসরের নামায ও পরবর্তী সময়)**

**১. আসরের আযান হলে ৪ রাকাত সুন্নাত নামায পড়তেন**

আসরের আযান হলে ৪ রাকাত সুন্নাহ নামায আদায় করতেন এবং অন্যদের আগ্রহ দিতেন।[১০৩]

**২. আসরের নামায আদায় করতেন এবং তিনি ইমামতি করতেন**

মসজিদে নববীতে জামাতে আসরের নামায আদায় করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি ইমামতি করতেন।[১০৪]

**৩. নামায শেষে সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসতেন**

আসরের নামাযের পর ঘুরে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে সময় দিতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতেন।[১০৫] তবে এ আলোচনা যোহর পরবর্তী আলোচনার তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতো।[১০৬]

**৪. স্ত্রীদের সময় দিতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের ঘরে যেতেন, তাদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং প্রয়োজন পূরণ করতেন।[১০৭] সে রাতে রাসূল (সা) যে স্ত্রীর ঘরে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিতেন; তার ঘরে গিয়ে দিন শেষ করতেন। কখনো কখনো সব স্ত্রীরা এক স্ত্রীর ঘরে এসে উপস্থিত হতেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে সময় দিতেন।[১০৮] স্ত্রীদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটাতেন এবং কোনো কোনো স্ত্রীর সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো।[১০৯]

**৫. সাহাবীদের দাওয়াতে যেতেন**

কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামাযের পর সাহাবীদের দাওয়াতে যেতেন।[১১০]

**৬. সম্পত্তি বণ্টন ও ঝগড়া-সমস্যার সমাধানে সময় দিতেন**

আছরের নামাযের পর কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পত্তি বণ্টন ও বিভিন্ন ঝগড়া-সমস্যার সমাধানে সময় দিতেন। সাদ বিন রাবিআ (রা)-এর কন্যাদের মাঝে সম্পতি বণ্টনের ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ।[১১১]

## সাত : রাতের প্রথম প্রহরের আমল
## (মাগরিবের নামায ও তার পরবর্তী সময়)

**১. মাগরিবের আযানের পর দোআ পড়তেন**

মাগরিবের আযানের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দোআ পাঠ করতেন। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার প্রদত্ত রাত আসছে, দিন যাচ্ছে, মুআজ্জিনের আহবান শুনতে পাচ্ছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।[১১২]

**২. রোযা থাকলে দোআ পড়ে ইফতার করতেন**

রোযা থাকলে মাগরিবের আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিতেন।[১১৩] রোযা পালন করলে মাগরিবের নামাযের আগে খেয়ে নিতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন, খাবার এলে মাগরিবের আগেই খাও। খাবারের আগে মাগরিব পড়ো না।[১১৪]

ইফতারের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোআ পড়তেন। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য আমি রোযা রেখেছি, আপনার দেওয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করছি।[১১৫]

**৩. জামাতে নামায আদায় করতেন এবং ইমামতি করতেন**

মাগরিবের আযানের সাথে সাথে বাসা থেকে বের হতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জামাতে নামায আদায় করতেন এবং তিনি ইমামতি করতেন। সাধারণত, সময় হওয়ার সাথে সাথে মাগরিব পড়তেন।[১১৬] ছোট ছোট সূরা পড়তেন। কখনো লম্বা সূরাও পড়তেন।[১১৭]

**৪. বিভিন্ন দোআ-মামুলাত আদায় করতেন**

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালের মতো বেশ কিছু দোআ-মামুলায় পাঠ করতেন। যেসব দোআ-মামুলাতের কথা হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১১৮]

**৫. কখনো কখনো ২ রাকাত সুন্নাত নামায ঘরে এসে আদায় করতেন**

মাগরিবের নামায শেষে ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১১৯]

**৬. ঘুমানো অপছন্দ করতেন**

হযরত আবু বারজা আসলামি (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের পর ঘুমানো অপছন্দ করতেন।[১২০]

**৭. পানাহার সেরে নিতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামাযের আগেই সাধারণত রাতের খাবার খেতেন। রোযা হলে মাগরিবের আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিতেন।[১২১]

রাতে সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারিদ, গোশত, রুটি খেতেন।[১২২] সকাল থেকে পানিতে খেজুর ও কিশমিশ অথবা মধু মিশিয়ে রেখে একটি পানীয় তৈরি করা হতো। রাতের খাবারের সময় এটাও রাসূল (সা)কে দেওয়া হতো।[১২৩]

রাসূল (সা) খাবারে ফু দিতেন না। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা) বলেন, খাবারে ফু দিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।[১২৪] পানির পাত্রে শ্বাস ছাড়তে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু কাতাদা (রা) পিতার

সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করবে, পানির পাত্রে যেন শ্বাস না ছাড়ে।[১২৫]

খাবার অপছন্দ হলে খেতেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু তিনি খাবারের দোষ ধরতেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না, ইচ্ছা হলে খেতেন, অন্যথায় খেতেন না।[১২৬]

**৮. দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খেতেন**

দস্তরখান বিছিয়ে বসে খানা খেতেন রাসূল (সা)।[১২৭] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে খাবার খেতেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন খাবে, তখন যেন শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে। শুরুতে বলতে ভুলে গেলে মধ্যখানে যেন বলে–

অর্থ : খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে।[১২৮]

থালার কাছের দিক থেকে খেতে শুরু করতেন রাসূল (সা)।[১২৯] তিন আঙুল ব্যবহার করে এক একটি লোকমা মুখে দিতেন।[১৩০] খাবার শেষে আঙ্গুল চেটে খেতেন।[১৩১] খাবারের থালা বা বরতনও চেটে খেতেন তিনি। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পাত্র চেটে খাওয়ার আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের তো জানা নেই, পাত্রের কোন অংশে বরকত আছে?[১৩২]

**৯. খাবারের মজলিশে আলোচনা করতেন**

খাবার মজলিশে সাহাবিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে খেতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সংক্ষেপে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো।[১৩৩] স্ত্রীদের সঙ্গে খেতে বসলে প্রেমময় আবহে সময় কাটাতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীদের মুখে যে লোকমাটি তুলে দেবে; তা তোমাদের দানের সাওয়াব দিবে।[১৩৪]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মাসিকের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার সঙ্গে খেতে ডাকলেন। হাড়অলা গোস্ত নিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমি সেই গোস্ত কিছুটা খেয়ে রেখে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা হাতে নিয়ে ঠিক আমি সেখানে মুখ লাগিয়েছি, সেখানে মুখ লাগিয়ে খেলেন। এরপর তিনি আমাকে পানি খেতে বললেন। পানি খেয়ে আমি পেয়ালাটা রেখে দিলাম। এরপর তিনি পেয়ালার ঠিক সেখানেই ঠোঁট ছোঁয়ালেন, যেখানে ঠোঁট ছুঁইয়েছিলাম আমি।[১৩৫]

**১০. দস্তরখান উঠানোর দোআ পড়তেন**

খাবার খাওয়া শেষ হলে দস্তরখান উঠানোর সময় একটি দোআ পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । দোআটি হলো–

অর্থ : আল্লাহর প্রশংসা। বেশুমার, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। আমাদের যিনি এতো অঢেল খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, তার তরে সব প্রশংসা। আমাদের প্রভুর অকৃতজ্ঞ হওয়া যায় না। আমরা তাঁর থেকে মুখ ফেরাই না। তাঁর অনুগ্রহের প্রয়োজন অস্বীকার করি না। হে আমাদের প্রভু! আপনিই আমাদের খানাপিনা দিয়েছেন। দৌলত আর মর্যাদা দিয়েছেন। দিকনির্দেশনা আর জীবন দিয়েছেন। আপনি যত যা দিয়েছেন তার জন্য সব প্রশংসার দাবিদার শুধু আপনিই।[১৩৬]

**১১. রাতের খাবারের পর দুধ পান করতেন এবং কুলি করতেন**

রাতের খাবার খাওয়ার পর দুধ পান করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুধ পান করার পর তিনি কুলি করতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, দুধে চর্বি থাকে।[১৩৭]

**১২. দোআ পড়ে দুধ পান করতেন**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুধ পান করার পর মানুষ যেন নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করে। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! এই দুধে আমাদেরকে বরকত দিন এবং আরও বৃদ্ধি করে দিন।[১৩৮]

**আট : রাতের মধ্যপ্রহরের আমল (ইশার নামাযের পর)**

**১. ইশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত বাসায় অবস্থান করতেন**

ইশার আযান না হওয়া পর্যন্ত ঘরেই অবস্থান করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১৩৯]

**২. ইশার নামায জামাতে আদায় করতেন এবং তিনিই ইমামতি করতেন**

ইশার নামায জামাতে আদায় করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কোনো তাড়াহুড়া করতেন না। সাহাবায়ে কেরাম খাওয়া-দাওয়া করে একত্রিত হলে পরে নামায পড়তেন।[১৪০] ইশার নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন না।[১৪১]

**৩. প্রয়োজন অনুসারে ইশার পর সাহাবীদের সঙ্গে কথা বলতেন**

ইশার নামাযের পর সাধারণত তিনি সাহাবিদের সঙ্গে কথা বলতেন না। বললেও অল্পস্বল্প বলতেন।[১৪২] কখনো কখনো হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময়ও করতেন।[১৪৩]

**৪. বাসায় ফিরে ২ রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করতেন**

ইশার নামায শেষে বাসায় ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু রাকাত সুন্নাহ নামায আদায় করতেন।[১৪৪]

**৫. বাসায় এসে স্ত্রীদের সাথে কথা বলতেন**

ইশার নামাযের পর বাসায় ফিরে স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন। তাদের কুশলাদি জেনে প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করতেন।[১৪৫]

**৬. কখনো কখনো মুহাজির সাহাবীদের বাড়িতে যেতেন**

কখনো কখনো ইশার নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির সাহাবীদের বাড়িতে যেতেন।[১৪৫] ফেরার সময় পথিমধ্যে সাহাবিদের কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন।[১৪৬]

**৭. বাহির থেকে বাসায় ফেরার আগে মসজিদে ২ রাকাত নামায আদায় করতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামাযের পর যখন বাহিরে যেতেন, ঘরে ফেরার পথে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।[১৪৭]

**৮. ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতেন এবং দ্রুত ঘুমিয়ে যেতেন**

ঘুমানোর সময় হালকা পোশাক পরিধান করতেন। সাদামাটা বিছানায় শয্যা গ্রহণ করতেন।[১৪৮] তাঁর বিছানার চাদর ছিল আঁশযুক্ত পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি। বালিশও ছিল একই উপাদানের। একটি বালিশে ভাগাভাগি করে শুয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার স্ত্রী।[১৪৯] ঘুমানোর আগে মিসওয়াক করতেন।[১৫০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বালিশ ছিল চামড়ার, ভিতরে আঁশ ছিল।[১৫১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ঘুম থেকে সজাগ হন, তখন তার গায়ে চাটাইয়ের দাগ ছিল। হযরত উমর (রা) এ দৃশ্য দেখে অবাক হন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি কিছুটা আরামদায়ক বিছানা নিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, আমি তো দুনিয়ায় দুই দিনের মুসাফির। আমার অবস্থা হলো, একজন মুসাফির যেভাবে চলার পথে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। কিছুক্ষণ পর আবার চলে যায়।[১৫২]

ইশার নামাযের পর ঘুমাতে দেরি করা রাসূল (সা) অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।[১৫৩] ডান কাত হয়ে, ডান হাত গালের নীচে দিয়ে শুয়ে পড়তেন।[১৫৪]

**৯. বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন**

বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ স্বামী-স্ত্রী মিলে কথাবার্তা বলতেন। তাদের এই আলাপচারিতা জুড়ে থাকতো ভালোবাসা আর সুখের ছোঁয়া।[১৫৫]

**১০. ঘুমানোর দোআ পড়তেন**

ঘুমানো সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ কয়েকটি দোআ পাঠ করতেন। একটি দোআ হলো–

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করি (ঘুমও এক প্রকার মৃত্যু)। আবার জেগে উঠি।[১৫৬]

**১১. ঘুমের শুরুতে শরীরে ফু দিতেন**

কখনো কখনো ঘুমানোর শুরু দু হাত আজলা করে কুরআনের শেষ তিন সূরা পড়ে তাতে ফু দিয়ে মাথা, মুখ আর শরীরের সামনের অংশ মুছতেন। কাজটি তিনবার করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১৫৭]

**১২. প্রয়োজন অনুভব করলে সহবাস করতেন**

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাময় কথাবার্তায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি প্রয়োজন অনুভব করতেন তাহলে সহবাস করতেন। যদি স্ত্রীর মাসিক চলতো তবুও তাকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতেন না তিনি। স্ত্রীকে বলতেন, কোমরে ভালো করে কাপড় পেচিয়ে রাখো। এরপর শুধু আদর-সোহাগে সীমাবদ্ধ থাকতেন।[১৫৮]

**১৩. সহবাসের সময় দোআ পড়তেন**

স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দোআটি পড়তেন এবং উম্মাহকে দোআটি পড়তে বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন উক্ত দোআ পড়ে যেন মিলিত হয়। এ মিলনে যদি তাদের কিসমতে কোনো সন্তান আসে, সে সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দোআটি হলো–

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নামে (সহবাস) আরম্ভ করছি। তুমি আমাদের (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের) কাছ থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবেন, সে সন্তানকেও শয়তান (যাবতীয় আক্রমণ) থেকে দূরে রাখ।[১৫৯]

**১৪. স্ত্রী সহবাস করার পর গোসল করতেন**

সহবাস শেষে ঘুমের আগেই সাধারণত গোসল সেরে নিতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । কখনো আবার শুধু অজু করে ঘুমিয়ে যেতেন। এরপর ঘুম থেকে জেগে গোসল করতেন।[১৬০]

**১৫. ঘুমের সময় বালিশের পাশে মিসওয়াক রাখতেন**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমের সময় বালিশের পাশেই মিসওয়াক রাখতেন, যাতে ঘুম ভাঙলেই দাঁত মাজতে পারেন। দিনে কিংবা রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন, সাথে সাথে মিসওয়াক করতেন তিনি।[১৬১]

**১৬. ঘুমে মাঝে এপাশ ওপাশ করলে দোআ পড়তেন**

ঘুমের মাঝে এপাশ ওপাশ ফিরলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দোআ পড়তেন। দোআটি হলো–

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহাপ্রতাপশালী এ সত্তা। মহাকাশমালা আর পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে সবকিছুর প্রভু তিনি। সর্বশক্তিমান। অতিশয় ক্ষমাশীল।♦

*মিরাজ রহমান : চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রতিদিন*
*শাহ মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ : সিইও, দ্য কুরাইশ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড*

**তথ্যসূত্র :**

১. বুখারি, ১১২০।
২. বুখারি, ৬৩১২, ৬৩১৪, ৭৩৯৪।
৩. বুখারি, ১১৩৬; মুসনাদে আহমাদ, ৩৫৪১।
৪. মুসলিম, ৩৭৫।
৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১০/৪৫৪।
৬. বুখারি, ৬৪০; মুসলিম, ৬০৫; ইবনে মাজাহ, ৫৪১।
৭. বুখারি, ১১৪২; মুসলিম,৭৬৩।
৮. তিরমিজি, ২৫।
৯. নাসায়ী, ৯৯০৮।
১০. মুসলিম, ২৩৪।
১১. মুসনাদে আহমাদ, ২৫১০২; আবু দাউদ, ৫৬, ৫৭; ইবনে মাজাহ, ১৩৬৩।
১২. বুখারি, ১১৩৯।
১৩. বুখারি, ১১৩৫।
১৪. বুখারি, ১১৩৫।
১৫. বুখারি, ১১২৩।
১৬. মুসলিম, ৭৭২; মুসনাদে আহমাদ, ২৩৩৬৭।
১৭. বুখারি, ১১২০; মুসনাদে আহমাদ, ৭২৯; মুসলিম ৭৭২; তিরমিজি, ২৬২।
১৮. বুখারি, ৫১২, ৯৯৭; মুসলিম, ৭৪৪; মুসনাদে আহমাদ, ২৭২০; তিরমিজি, ৪৬২।
১৯. মুন্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, ৬৯৪৩; তিরমিজি, ৩৫৬৬; মুসনাদে আহমাদ, ১৫৩৫৪।
২০. মুসলিম, ৯৭৪; আবু দাউদ, ৩২৩৭; মুসনাদে আহমাদ, ৮৮৭৮।
২১. বুখারি, ১১২৭; মুসলিম, ৭৭৫; মুসনাদে আহমাদ, ৫৫৭১।
২২. বুখারি, ১৯২৩।

২৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৯০০৯।
২৪. প্রাগুক্ত, ৯০১০।
২৫. বুখারি, ৯১৪; মুসনাদে আহমাদ, ১৬৮২৮; আবু দাউদ, ৫২৬।
২৬. বুখারি, ৬১৪, ৪৭১৯; তিরমিজি, ২১; মুসনাদে আহমাদ, ১৪৬১৯।
২৭. বুখারি, ৬১৮; মুসলিম, ৭২৩; তিরমিজি, ৪৫৯।
২৮. বুখারি, ১১৫৯।
২৯. বুখারি, ১১৬০; মুসলিম, ৭৩৬; তিরমিজি, ৪১৮।
৩০. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ লি ইবনিস সুন্নি, ১০৭।
৩১. তিরমিজি, ৩৪২৬।
৩২. বুখারি, ৭৪৯৯।
৩৩. মুসলিম, ৭১৩; আবু দাউদ; ৪৬৫ তিরমিজি, ৩১৪।
৩৪. বুখারি, ৭১৯,৭২৩; মুসলিম, ৪৩৩; মুসনাদে আহমাদ, ১২০১১, ১২৮১৩।
৩৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৩৫৬৪।
৩৬. প্রাগুক্ত, ৩৫৬৩।
৩৭. বুখারি, ৪৫৬০; মুসলিম, ৬৭৭; তিরিমিজি, ৫২০; মুসনাদে আহমাদ, ২৭৯৯, ২৯০৬।
৩৮. মুসলিম, ১৩৫; তিরমিজি, ৩০০; বুখারি, ২৮২২; আবু দাউদ, ১৫২২।
৩৯. বুখারি, ৪৫৮, ৩৬৭৯, ৩৬৮০, ৩৮১৩; মুসলিম, ২৪৮৪; মুসনাদে আহমাদ, ৮৬৩৪, ১৭১৪২।
৪০. ইবনে হিব্বান, ৪৭৫৪।
৪১. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহি, ১৪৮।
৪২. মুসনাদে আহমাদ, ১১/২১৪।
৪৩. তিরমিজি, ৪৭৫; আবু দাউদ, ১২৮৯।
৪৪. আবু দাউদ, ৪৬৫; ইবনে মাজাহ, ৭৭২।
৪৫. মুসলিম, ২৩২৪; মুসনাদে আহমাদ, ১২৪০১; বাইহাকী, ১/৩৩১।
৪৬. মুসলিম, ৬৭০, নাসায়ী, ১৩৫৭।
৪৭. বুখারি, ৪৭৯৮; মুসলিম, ২৫৩; মুসনাদে আহমাদ, ১৩০২৫।
৪৮. তিরমিজি, ৩৫৫৫; ইবনে মাজাহ, ৩৮০৮।
৪৯. আবু দাউদ, ৩৭২১।
৫০. বুখারি, ১৪৯৪; মুসনাদে আহমাদ, ২৪২২০।
৫১. বুখারি, ২৮৮; মুসলিম, ৩০৫; নাসায়ী, ২৫৭
৫২. বুখারি, ১৪৯৮; মুসলিম, ১০৭৬; তিরমিজি, ৭৩৩; মুসনাদে আহমাদ, ২৪২২০।
৫৩. বুখারি, ৫০২; মুসলিম, ৫০৯; মুসনাদে আহমাদ, ১৬০১৬।
৫৪. আবু দাউদ, ৪৬৯৮।
৫৫. বুখারি, ২৬৫৪, ৫৯৭৬; মুসনাদে আহমাদ, ১২৩৩৬।
৫৬. মুসলিম, ১০২৮; তিরমিজি, ২৪৫৪।
৫৭. মুসলিম, ২৭০২; তিরমিজি, ৩৪৩৪; মুসনাদে আহমাদ, ৪৭২৬।
৫৮. বুখারি, ৩৯০৯; মুসলিম, ২১৪৪; মুসনাদে আহমাদ, ১২৭৯৫।

৫৯. তিরমিজি, ৩৬২৫; মুসনাদে আহমাদ, ১৩৫, ১৯৬।
৬০. বুখারি, ৬১, ৫৪৪৪; মুসলিম, ২৮১১।
৬১. মুসলিম, ১৩৭৩; তিরমিজি, ৩৪৫৪।
৬২. মুসলিম, ১০১৭; মুসনাদে আহমাদ, ১৯১৭৪; বুখারি, ৪৩৮৬।
৬৩. বুখারি, ২৭১১; মুসনাদে আহমাদ, ১৮৯২৮।
৬৪. তিরমিজি, ৩৪৩৩; মুসনাদে আহমাদ, ১০৪১৫; আবু দাউদ, ৪৮৫৭।
৬৫. বুখারি, ২১২২; মুসনাদে আহমাদ, ৭৩৯৮।
৬৬. বুখারি, ৩৮০, ৮৬০; মুসনাদে আহমাদ, ১২৫০৭; মুসলিম, ৬৫৮।
৬৭. বুখারি, ২০৯২, ৫৪২০; মুসলিম, ২০৪১; আবু দাউদ, ৩৭৮২।
৬৮. বুখারি, ৬১২৯; মুসলিম, ২১৫০; মুসনাদে আহমাদ, ২৩৬২০; ইবনে মাজাহ, ৬৬০।
৬৯. মুসনাদে আহমাদ, ১২১৭৭; মুসলিম, ২০৪২; তিরমিজি, ৩৫৭৬।
৭০. বুখারি, ১৩০৪; মুসলিম, ৯২৪।
৭১. বুখারি, ৬৭২৩; মুসনাদে আহমাদ, ১৪১৮৬।
৭২. তিরমিজি, ১২০৯।
৭৩. বুখারি, ২০৮২।
৭৪. বুখারি, ২০৭৬।
৭৫. বুখারি, ৩০৩৫; মুসনাদে আহমাদ, ১৯১৭৩।
৭৬. তিরমিজি, ৩৫০২; নাসায়ী, ১০২৩৪।
৭৭. আবু দাউদ, ১৮৫; ইবনে মাজাহ, ৩১৭৯।
৭৮. মুসনাদে আহমাদ, ১২৪০৬; সুনানে বাইহাকী, ৭/২৮৭; আবু দাউদ, ৫১৮৬।
৭৯. মুসনাদে আহমাদ, ১২৪৩৮; মুসলিম, ৩১; বুখারি, ১৪৬১।
৮০. বুখারি, ৩৬৭৪; মুসলিম, ২০৯১।
৮১. বুখারি, ১১৯১, ১১৯৩।
৮২. মুসনাদে আহমাদ, ৩৩৯১৪।
৮৩. বুখারি, ৪৭৯৪; মুসলিম, ২৫৩।
৮৪. ইবনে খুজাইমা, ১৩৪।
৮৫. বুখারি, ১১০৪; মুসলিম, ৩৩৬; মুসনাদে আহমাদ, ২৪৪৫৬; তিরমিজি, ৪৭৪।
৮৬. বুখারি, ৩১৪; মুসলিম, ৩৩২; মুসনাদে আহমাদ, ২৫২৪৫; তিরমিজি, ১১৩।
৮৭. বুখারি, ১৪৯৪; মুসনাদে আহমাদ, ২৪২২০।
৮৮. বুখারি, ৪৭৯৪; মুসলিম, ১৪২৮; নাসায়ী, ৮।
৮৯. আল ইয়াওমুন নাবাওয়ি, ৫৬।
৯০. মুসলিম, ২৪০১; মুসনাদে আহমাদ, ৫১৪।
৯১. মুসতাদরাকে হাকিম, ৭১৬৩।
৯২. আবু দাউদ, ৩৮৫০।
৯৩. আবু দাউদ, ৩৮৫৪।
৯৪. মুসলিম, ৭৩০; মুসনাদে আহমাদ, ২৪০১৯।
৯৫. তিরমিজি, ৮৬; মুসনাদে আহমাদ, ২৫৭৬৬; আবু দাউদ, ১৭৯।

৯৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৩২১৯১; মুসনাদে আহমাদ, ১৬০৩৩।
৯৭. মুসনাদে আহমাদ, ১৮০২, ১৪৯৬৯।
৯৮. বুখারি, ২৫৯৭, ৬৬৩৬; মুসলিম, ১৮৩২; আবু দাউদ, ২৯৪৬; মুসনাদে আহমাদ, ২৩৫৯৮।
৯৯. মুসনাদে আহমাদ, ২৪০১৯।
১০০.মুসনাদে আহমাদ, ৯৯৫৩, ২৪২৩৫।
১০১. মুসলিম, ১৬৯২; মুসনাদে আহমাদ, ২০৮০৩।
১০২.মুসনাদে আহমাদ, ২৪০১৯; আবু দাউদ, ১২৫১।
১০৩. বুখারি, ১২১৮; মুসলিম, ৪২১; মুসনাদে আহমাদ, ২২৮৫২।
১০৪.তিরমিজি, ৪২৯, ৪৩০; মুসনাদে আহমাদ, ৬৫০; নাসায়ী, ৮৭৪।
১০৫.বুখারি, ৫৪১, ৫৯৯; মুসলিম, ৫৪১, ৫৯৯; মুসনাদে আহমাদ, ১৪৯৬৯।
১০৬.মুসলিম, ২৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৭৬৪৮; মুসনাদে আবু আওয়ানা, ৬১৩।
১০৭.মুসলিম, ২৩৪; মুসনাদে আহমাদ, ১৭৩৯৩।
১০৮. মুসনাদে আহমাদ, ২৪৭৬৫; আবু দাউদ, ২১৩৫; আল মুসতাদরাক, ২/১৮৬।
১০৯.আবু দাউদ, ২১৩৫; মুসলিম, ১৪৬২।
১১০. বুখারি, ৩২৩১; মুসলিম, ২৮৭৬; মুসনাদে আহমাদ, ২৭০৪২।
১১১. মুসলিম, ৬৯৪; ইবনে হিব্বান, ১৫১৬।
১১২. তিরমিজি, ২০৯২; মুসনাদে আহমাদ, ১৪৭৯৮।
১১৩. আবু দাউদ, ৫৩০।
১১৪. বুখারি, ৬৭২; তিরমিজি, ৩৫৩; নাসায়ী, ৮৫৩।
১১৫. বুখারি, ৬৭২; মুসলিম, ৫৫৭; তিরমিজি, ৩৫৩।
১১৬. আবু দাউদ, ২৩৫৭।
১১৭. বুখারি, ৫৫৯; মুসলিম, ৬৭৩; আবু দাউদ, ৫৩০; তিরমিজি, ৩৫৮৯।
১১৮.বুখারি, ৭৬৩; মুসলিম, ৪৬২; আবু দাউদ, ৮১২।
১১৯. তিরমিজি, ৩৩৮৮; আবু দাউদ, ৫০৮৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮৬৯; বুখারি, ৬০৬১; তিরমিজি, ৩৩৯৩।
১২০.মুসনাদে আহমাদ, ২৪২৪৬; ইবনে মাজাহ, ৯৩৩।
১২১. বুখারি, ৫৬৮।
১২২.বুখারি, ৬৭২; তিরমিজি, ৩৫৩; নাসায়ী, ৮৫৩।
১২৩. বুখারি, ৩৩৪০; মুসলিম, ১৯৪।
১২৪.মুসলিম, ১৯৯৯; মুসনাদে আহমাদ, ২০৬৮।
১২৫.তিরমিজি, ১৮৮৭।
১২৬. তিরমিজি, ১৮৮৯।
১২৭.বুখারি, ৫৪০৯; মুসলিম, ২০৬৪।
১২৮. বুখারি, ৫৩৮৬; মুসনাদে আহমাদ, ৯২৪৯।
১২৯.তিরমিজি, ১৮৫৮।
১৩০. বুখারি, ৫৩৭৬।
১৩১. মুসলিম, ২০৩১; মুসনাদে আহমাদ, ১৬৫৯৫।

১৩২. তিরমিজি, ১৮০৩; মুসনাদে আহমাদ, ১২৮১৫।
১৩৩. মুসলিম, ২০৩৪।
১৩৪.বুখারি, ৫৩৭৬; মুসলিম, ২০২২।
১৩৫. বুখারি, ২৭৪২; মুসলিম, ১৬২৮; তিরমিজি, ২১১৬।
১৩৬. মুসলিম, ৩০০; মুসনাদে আহমাদ, ২৪৩২৮।
১৩৭.বুখারি, ৫৪৫৮; তিরমিজি, ৩৪৫৬; মুসনাদে আহমাদ, ১৮০৭১।
১৩৮. বুখারি, ২১১, ৫৪৫৪; মুসলিম, ৩৫৮; তিরমিজি, ৮৯।
১৩৯. তিরমিজি, ৩৪৫৫; আবু দাউদ, ৩৭৩০।
১৪০.বুখারি, ৫৬০; মুসলিম, ৬৩৮; মুসনাদে আহমাদ, ৪৮২৬।
১৪১. বুখারি, ৫৬০; মুসলিম, ৬৩৮; মুসনাদে আহমাদ, ৪৮২৬।
১৪২.মুসনাদে আহমাদ, ১২৭৩৪; বুখারি, ৩৭৬; মুসলিম, ৪৭০।
১৪৩.বুখারি, ৫৬৮; মুসলিম, ৬৪৭; মুসনাদে আহমাদ, ৯৬২।
১৪৪.মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৬৬৮৯; বুখারি, ৪৫৬৯; মুসলিম, ৭৬৩, ২০৫৫।
১৪৫.মুসনাদে আহমাদ, ২৪০১৯।
১৪৬.বুখারি, ৪৫৬৯; মুসলিম, ৭৬৩, ২০৫৫; মুসনাদে আহমাদ, ১৭৫।
১৪৭. বুখারি, ৪৫৬৯; মুসলিম, ২০৫৫।
১৪৮.বুখারি, ৫০৪৮; মুসলিম, ৭৯৩; মুসনাদে আহমাদ, ২৩০৩৩।
১৪৯.মুসলিম, ২০৫৫; তিরমিজি, ২৭১৯।
১৫০.মুসলিম, ১৪৭৯; আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১৬৩।
১৫১. মুসলিম, ১৪৭৯; মুসনামে আহমাদ, ২৪৭২; ইবনে মাজাহ, ৪১৫১।
১৫২.মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৭৯১; মুসনাদে আহমাদ, ২৪৮৮।
১৫৩. তিরমিজি, ৩২২।
১৫৪.মুসতাদরাকে হাকিম : ৫/৪৪০।
১৫৫. বুখারি, ৫৬৮।
১৫৬. বুখারি, ৬৩১২; মুসলিম, ২৭১১; তিরমিজি, ৩৩৯৭।
১৫৭.বুখারি, ৩০২; মুসলিম, ২৯৩; তিরমিজি, ১৩২।
১৫৮. বুখারি, ৬০৮০।
১৫৯. বুখারি, ৫০১৭; মুসলিম, ২১৯২; তিরমিজি, ৩৪০২।
১৬০. বুখারি, ৩০২; মুসলিম, ২৯৩; মুসনাদে আহমাদ, ২৫৪১৬।
১৬১. বুখারি, ৬/১৪১; মুসলিম, ২/১০২৮।
১৬২. মুসলিম, ৩০৭; তিরমিজি, ২৯২৪; মুসনাদে আহমাদ, ২৪৪৫৩।
১৬৩. বুখারি, ২৪৫; মুসলিম, ২৫৫; মুসনাদে আহমাদ, ২৪৮৮।
১৬৪.বুখারি, ৬৯৮; মুসলিম, ৭৬৩; মুসনাদে আহমাদ, ৩১৯৪।

# শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ে মহানবী (সা)

## মূল : ড. ফারহাত নাজ রহমান

## অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ

*বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ইসলামি পণ্ডিত ড. ফারহাত নাজ রহমান স্যার সৈয়দ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলোজি, করাচি'র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩০টি। তন্মধ্যে Spiritual healing and sufi practices, Political Participation of women: Contemporary perspective of Gender and Islam, Islamic approaches to human resource management in organizations, Theory of islamic financial system and economic growth, Is Democracy Compatible With Islam? Responsibilities of today's Muslim women for the advancement of Islamic values in the light of Sunnah, RITES AND CEREMONIES THE PRACTICE OF CONTEMPORARY SUFI ORDERS & SUB-ORDERS IN SUB CONTINENT প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লেখাটি লেখকের 'Prophet Muhammad (sm) on peace and social justice' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ, ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহীত।– অনুবাদক*

## সারাংশ

আধুনিক বিশ্বে ইসলামকে অন্যান্য মতবাদ-বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। আত্মঘাতি বোমা হামলাকারী এবং অন্যদের দ্বারা নিরীহ মানুষ হত্যার দৃষ্টান্ত আজ আমরা প্রায় প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি। আল্লাহর সত্যনবীর জীবনাদর্শের আলোকে এটা কী যুক্তিযুক্ত হতে পারে? মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? আদর্শের বিপরীতে বিদ্যমান বাস্তবতা কী? এই প্রবন্ধে আমরা ইসলামের শান্তি ও ন্যায়বিচারের ধারণাগুলির ওপর দৃষ্টিপাত ও মুসলমানদের জীবনে সেসবের গভীর তাৎপর্য অন্বেষণ করতে চেয়েছি। প্রবন্ধটিতে বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব প্রেক্ষাপটে শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিকের ওপর সংক্ষেপে আলোচনা ও মুসলিম-জীবনে এসবের গভীর তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। মহানবী (সা)-এর যেসব বাণী এই গবেষণায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হবে, মুসলিম-বিশ্ব এবং পাশ্চাত্য বিশ্ব– উভয় ক্ষেত্রেই তার বহুমুখী প্রভাব রয়েছে। বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়োজন যথাযথ আচরণবিধি ও 'রোল মডেল'– অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বা আদর্শ। মহানবী (সা)-এর শিক্ষা-আদর্শই কাঙ্ক্ষিত আচরণবিধি (অর্থাৎ আইন)-র যোগান দেয় এবং তাঁর জীবনই রেফারেন্স-পয়েন্ট বা সূত্র-কেন্দ্র, রোল মডেল। নবী করীম (সা)-এর হাদিস এবং প্রতিপক্ষ, সঙ্গী ও অনুসারীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা, উপরন্তু, মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত তাঁর উপদেশাত্মক ভাষণ-বক্তৃতাসমূহ– এগুলোই এই গবেষণার মূল উদ্দিষ্ট। তাঁর বক্তৃতা-ভাষণের নিপুণ ও হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার সার্বিকভাবে মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর অঙ্গীকারসমূহ অর্থপূর্ণ ও কার্যকরভাবে যোগাযোগ রক্ষায় সক্ষমতা প্রদর্শন করে। তাঁর বাণী ও ভাষণসমূহ প্রমাণ করে যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে দয়া, নম্রতা, সংযম, ন্যায়পরাণতা, স্বাধীনতা, ভদ্রতা-শালীনতা এবং ভালোবাসার দর্পণে দেখতে চেয়েছিলেন। এই গবেষণাপত্রটি এ যুক্তির ওপর আলোকপাত করে যে, পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা)-এর মৌলিক শিক্ষাসমূহ জাতিসংঘের আধুনিক সনদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশ্ব-সমাজব্যবস্থার জন্যও প্রবন্ধটি যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।



মূল প্রতিপাদ্য: **শান্তি, ন্যায়বিচার, ইসলাম, নবী মুহাম্মদ (সা), সহনশীলতা, সমতা।**

## শান্তি ও ন্যায়বিচার বিষয়ে নবী মুহাম্মদ (সা)

বিনয়-নম্রতা আজ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। রাজনৈতিক বিভেদ এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মানবজাতিকে বিভক্ত করেছে। পৃথিবীতে অন্যায়ের বিস্তার ব্যাপকভাবে ঘটেছে। ন্যায়ের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছাড়া এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আপনি যতই অন্যায় দেখবেন, ততই আপনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন। কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়– সে ব্যাপরে মানবজাতির সামনে যখন দিকনির্দেশনার অভাব থাকে, তখন জীবন ও সমাজের পুরো কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সমগ্র মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন; আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নিয়মকানুন-সহ সঠিক পথে স্থিত থাকার জন্য। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এর প্রতিটি নিয়ম-বিধানই মানবতার কল্যাণের জন্য, যা ইসলামি শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে। সফলভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের জীবনে যা যা প্রয়োজন, সবই পবিত্র কুরআনে পাওয়া যাবে। এসব ঐশী বিধানের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠার আইন। ইসলাম এমনই একটি শব্দ, যার অর্থ শান্তি, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ এবং এমন একটি মই, যার উপর মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আরোহণ করতে পারে– পরিণামে যা সহনশীলতার সাথে সম্পর্কিত।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অত্যন্ত মূল্যবান। ন্যায়বিচারের বিনিময়ে শান্তি– কুরআনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুটি বিষয়– শান্তি ও ন্যায়বিচার শুধু পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন: ' আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।' [সূরা: নাহ্ল, আয়াত: ৯০] ন্যায় প্রতিষ্ঠা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের আইন। এটি ভারসাম্যের অংশ, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ন্যায়বিচার হিসেবে সমাজে শান্তি কায়েম করতে। ন্যায়পরায়নতার সারকথা হলো এই স্বীকৃতি যে: সব মানুষ সমান এবং এর অর্থ সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। আমরা একবার যদি মানব-সমতার নীতি গ্রহণ করি, তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রকার বর্ণবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও নৃ-কেন্দ্রিকতা পরিহার করতে হবে। এটি এমন একটা বিষয়, যা মেনে নেওয়া কিছু লোকের কাছে কঠিন; কিন্তু আমাদেরকে ন্যায় ও শান্তির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটাই একমাত্র প্রতিকার। নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার গুরুত্ব

অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের উপর ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

আসুন, আমরা বিশ্বের প্রথম সনদ, চুক্তি বা সংবিধান অথবা মদিনা সনদ নামক শান্তির দলিল দিয়ে শুরু করি; যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (সা) মদিনায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা নগর-রাষ্ট্রের বহুধর্মাবলম্বী দশহাজার মানুষের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য মহানবী (সা) কর্তৃক লিখিত ও প্রবর্তিত মদিনা সনদ সত্যিকার অর্থেই ছিলো এক স্মরণীয় রাজনৈতিক-সাংবিধানিক দলিল। প্রফেসর এম. হামিদুল্লাহ মদিনা সনদকে সংগত কারণেই বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে দাবি করেছেন। [The First Written Constitution in the World by Dr Muhammad Hamidullah published by Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1968.] অ্যারিস্টটলের এথেন্সের সংবিধান প্যাপিরাসের উপর লেখা হয়েছিল, যা এক আমেরিকান মিশনারি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে আবিষ্কার করেছিলেন এবং ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন [Translated by Frederic G. Kenyon, Internet. !996 The Avalon Project.], তা প্রকৃতপক্ষে কোনো সংবিধান ছিলো না; তা ছিলো এথেন্স নগর-রাষ্ট্রের সংবিধানের বিবরণী। প্রাচীন সমাজে মানুষের জীবনাচরণের উপর অন্য অনেক আইনগত দলিল পাওয়া গেছে, কিন্তু সেসবের একটিকেও সংবিধান হিসেবে গণ্য করা যায় না। মদিনা সনদই প্রথম এবং এটি "পশ্চিমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাশ্চাত্যে যুগান্তকারী দলিল – বিশ্বের প্রথম কার্যকর লিখিত জাতীয় সংবিধান হিসেবে বিবেচিত ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের আমেরিকান সংবিধান" [The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, 1991.]-এর এক হাজার বছরেরও পূর্ববর্তী। মদিনা সনদ ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দের 'ব্রিটিশ সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিল– ম্যাগনাকার্টার'-এরও প্রায় ছয়শো বছর পূর্বেকার।

যদিও মদিনা সনদের ধারা ৪৭টি, কিন্তু ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ এই সংখ্যা ৫২ বলে উল্লেখ করেছেন। [The First Written Constitution in the World, p. 9.] মদিনা সনদ, যেটি মহানবী (সা) মদিনায় হিজরতের পরপরই সেখানকার মিশ্র-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন, তা আজ পর্যন্ত সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রামরত সম্প্রদায়গুলোর সামনে প্রোজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এটি ছিলো মহানবী (সা) কর্তৃক প্রণীত ও নির্দেশিত এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল। এই দলিল যেকোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও বংশের সকল মানুষ এবং জোটকে সুরক্ষা দেয় ও সহযোগিতাকে বেগবান করে এবং এটি

কর্ম বা আমলের পার্থক্যের ভিত্তিতে ধার্মিকতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে। এতে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপাসনা করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং এই চেতনা মহানবী (সা)-এর পুণ্যবান সাহাবিদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। এটিই সাম্য, সহনশীলতা ও উপলব্ধির মর্মকথা। মহানবী (সা) এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন যে– মুসলিম শাসনাধীনে অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতার অভাব একটি গুরুতর অপরাধ।

*ড. ফারহাত নাজ রহমান*

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নীতিমালার শক্ত ভিত্তির উপর মদিনাকেন্দ্রিক এক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই নীতিমালার মধ্যে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিলো; এবং তা নবী (সা)-এর জীবন ও জীবনাচরণে স্পষ্ট প্রতিভাত। মদিনার প্রথম মুসলিম সম্প্রদায় এবং ইহুদিদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর ন্যায়পরায়ণতার মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। এটি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করে যে, মহানবী (সা) শক্তির জোরে ইসলাম প্রচার করেননি– এমন কি মদিনা নগরীতেও না; পক্ষান্তরে, তিনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান জোরদার করেছিলেন। "এটি জেনে রাখো: যদি কোনো মুসলমান অন্যায় করে, কাউকে অপমান করে, উত্যক্ত করে, রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত ঐশী গ্রন্থের অনুসারী কোনো ব্যক্তির সাথে খারাপ আচরণ বা কোনো আয়োজনের অপব্যবহার করে, তাহলে (এই অনৈতিক কাজের জন্য)

শেষবিচারের দিনে আমার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।" [আবু দাউদ শরিফের হাদিস]

সমাজের শান্তি নির্ভর করে আমাদের মধ্যে বিরাজমান শান্তির ওপর। মহানবী (সা)-এর অভিমত অনুযায়ী: একদিকে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ও লোভ– এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করে আমাদের নিজেদের মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত করতে হবে, অন্যদিকে আমাদের যুক্তি ও মেধার সমন্বয় বিধান করতে হবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দিষ্টের সাথে। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তিনিই, যিনি যুক্তির শক্তিতে তার ক্রোধ এবং লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যুক্তির শক্তিতে কোনো ব্যক্তির ক্রোধ ও লোভ নিয়ন্ত্রণকে মহানবী (সা) 'বড়ো ধরনের জিহাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সমাজে শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন; এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তি ও ন্যায়পরায়ণতার পথিকৃৎ। অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে এবং যুদ্ধের সময়ে শত্রুদের সাথে তিনি কেমন ব্যবহার করতেন, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো; কারণ, একটি সমাজের প্রকৃত গুণ-বৈশিষ্ট্য তখনই প্রকাশ পায় যখন সে চাপে পড়ে বা বৈরি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। মহানবী (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ মক্কার কুরাইশদের দুর্ব্যবহারের কারণে মদিনায় হিজরত করেছিলেন; মক্কায় মুসলমানেরা ছিলেন সংখ্যালঘু। যখন তাঁদের প্রতি কুরাইশদের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠলো, তখন মহানবী (সা) মদিনায় হিজরত করলেন। মদিনা আরবের উত্তরাঞ্চলীয় একটি শহর, যার অধিকাংশ অধিবাসী ইতোমধ্যেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। মদিনায় আবাসিত হওয়ার পর তিরি অনুধাবন করলেন যে, ওই নগরে সংখ্যালঘু একটি ইহুদি সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে ইচ্ছে বা আগ্রহ নেই। রাসূল (সা) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং মুসলমানদের সাথে একটি চুক্তি করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন; যাতে মদিনায় বসবাসরত উভয় ধর্মের অনুসারীরা তাদের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে, পাশাপাশি তাদের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও অবহিত হতে পারে। এই চুক্তির কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

* ইহুদিরা, যারা এই চুক্তির অধীনে আসবে, তারা অবশ্যই সকল প্রকার অপমান ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে সুরক্ষা পাবে; আমাদের লোকদের মতো তাদেরও সমান অধিকার থাকবে আমাদের সাথে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতার জন্য। ইহুদিদের মিত্ররা... এবং মদিনার অন্য সব অমুসলিম অধিবাসী মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে একটি যৌথ জাতি গঠন করবে।

* তারা মুসলমানদের অনুরূপ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে।

* ইহুদিদের মিত্ররা একইরকম নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

দোষীদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং শাস্তি প্রদান করা হবে। শত্রুর আক্রমণ থেকে মদিনাকে রক্ষার যুদ্ধ ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে যোগ দেবে। যারা এই চুক্তি মেনে নিয়েছে তাদের সবার কাছে মদিনার অভ্যন্তর হবে একটি পবিত্র স্থান। মুসলমানদের মিত্ররা এবং ইহুদিদের মিত্ররা এই সনদের অধীন প্রধান দলগুলোর সদস্য হিসেবে সম্মান পাবে।

মিসাক-ই-মদিনা বা মদিনা সনদ মুসলমানদের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল; কারণ, এটি সমাজে আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা এবং মদিনায় মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে; কিন্তু অন্যদিকে কেউ হুদাইবিয়ার সন্ধির গুরুত্বকে অবহেলা করতে পারে না, যা ইতিহাসে শান্তির এক স্মরণীয় দলিল হিসেবে স্থান পেয়েছে; কারণ, এটি মদিনার মুসলমানদেরকে চাপ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলো এবং কমপক্ষে দশটি বছর তাদের চিরশত্রু মক্কার কুরাইশদের শঙ্কা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছিলো।

মহানবী (সা)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইসলামি ইতিহাসের বহু শাসক অমুসলিম নাগরিকদের সাথে শান্তিপূর্ণ ও সহৃদয় সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। আমরা যদি উনবিংশ শতকের মুসলিম শাসকদের শাসনকালে সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের (মুসলিম শাসক) মনোভাবের সাথে ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংখ্যালঘুদের প্রতি ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের মনোভাবের তুলনা করি, তাহলে আমি সাহসের সাথে বলতে পারি: মুসলমানদের রেকর্ড অনেক ভালো হবে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রখ্যাত পশ্চিমা ঐতিহাসিক রোডেরিক এইচ. ডেভিসন লিখছেন: "বাস্তবিকপক্ষে এই অভিমতটি উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, প্রুসিয়ানরা পোলিশদের প্রতি, ইংরেজরা আইরিশদের প্রতি অথবা আমেরিকানরা নিগ্রোদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করেছিল, তার চেয়ে তুর্কিরা তাদের বশীভূত লোকদের প্রতি কম অত্যাচারী ছিল– এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে যে, এই সময়ে (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে) স্বাধীন গ্রিস থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্যে কিছু লোকের অভিবাসন ঘটেছিল; সেসময় কিছু গ্রিক দেখতে পায় যে, উসমানীয় সরকার তাদের নিজস্ব গ্রিক সরকারের চেয়ে অধিকতর প্রশ্রয়পূর্ণ।" [Reform of the Ottoman Empire 1856-1876, New Jersey, Princeton University Press, 1963, p. 116.]

কেউ যদি ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠ করেন, তাহলে তিনি দেখবেন যে, বহু-সাংস্কৃতিক ও বহু-বিশ্বাসের একমাত্র মডেল ছিলো মুসলিম

শাসনের অধীন স্পেন– যেখানে খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং মুসলামানেরা শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতেন।

**মহানবী (সা)-এর শেষ ভাষণ:** জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ, হিজরি ১০ সাল (৬৩২ খ্রি.) মক্কার নিকটস্থ আরাফাত পাহাড়ের উরনাহ্ উপত্যকায় বিশাল জনসমাবেশে তিনি এই ভাষণ দেন। এটি ছিলো বার্ষিক হজ্জ পালনের আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে আয়োজিত সমাবেশ। এটি বিদায় হজ্জ নামেও পরিচিত। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ প্রণীত হয় গত শতকের চল্লিশের দশকে [১৯৪৮ সালে– অনুবাদক] ; কিন্তু ইসলামের মানবাধিকার গৃহীত, ঘোষিত ও কার্যকর হয় চৌদ্দশত বছরেরও আগে। বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় যে কেউ মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ পাঠ করবেন, তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে মানবাধিকারের ঘোষণা দেখতে পাবেন। এই ঘোষণা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. সবার স্বাধীনতা।
২. জীবন, সম্পদ এবং সম্পত্তির পবিত্রতা।
৩. সব জাতিগোষ্ঠীর সমতা।
৪. আইনের সামনে এবং আল্লাহর সামনে ন্যায়বিচার।
৫. নারীর অধিকার ও বাধ্যবাধকতাসমূহ। তারা অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে, কিন্তু অধীনস্থ হিসেবে নয়।
৬. কোনো শোষণ কিংবা একচেটিয়া আধিপত্য থাকবে না। ধনী আরও ধনী হবে না, অন্যদিকে গরিব আরও গরিব হবে না।
৭. অন্যদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং প্রদান করা হবে।
৮. জনসাধারণ এই ঘোষণাটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে; তারা যেখানেই যাবে, এগুলো সর্বত্র প্রচার করবে এবং নিজেরা অনুশীলনও করবে।
৯. জীবন ও সম্পত্তির পবিত্রতা:বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা)-এর কণ্ঠে জীবন ও সম্পত্তির পবিত্রতার কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়: জনগণকে সুরক্ষা দিতে হবে, তাদের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করতে হবে।
১০. সুদ বিলোপ: অর্থনৈতিক শোষণের ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সুদ একধরনের অর্থনৈতিক শোষণ; সুতরাং ইসলাম এধরনের ব্যবসায় নিষিদ্ধ করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এধরনের অর্থনৈতিক একচেটিয়া প্রভাব ও শোষণের কারণে ধনী অধিকতর ধনী এবং গরিব অধিকতর গরিব হবে।
১১. নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ।

[সামান্য সংক্ষেপিত] ♦

# মহানবী (সা)-এর আদর্শ ও সর্বজনীনতা

## শামস সাইদ

সর্বজনীনতা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য প্রয়োগযোগ্য কল্যাণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) {৫৭০-৬৩২ খ্রি.} ছিলেন মানবজাতির অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মহান উদার ব্যক্তিত্ব। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী সবার অকৃত্রিম শিক্ষণীয় আদর্শ ও প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবী করিম (সা) একাধারে সমাজসংস্কারক, ন্যায়বিচারক, সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ প্রশাসক, যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক এবং সফল ধর্মপ্রচারক। কল্যাণকর প্রতিটি কাজেই তিনি সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

মহানবী (সা) অবিস্মরণীয় ক্ষমা, মহানুভবতা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠ প্রভৃতি বিরল চারিত্রিক মাধুর্য দিয়েই আরব জাতির আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই আরবরাই তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দুনিয়ার মানুষকে অর্থের দ্বারা বশীভূত না করে বরং তাদের সদাচরণ, উত্তম ব্যবহার এবং সততার দ্বারা বশীভূত করেছেন মহানবী (সা)। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল-কালাম, আয়াত: ৪)

কখনো তিনি মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান ও হেয়প্রতিপন্ন করেননি বা নগণ্য ভাবেননি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মতনির্বিশেষে সব মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে

পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতর স্বভাব-চরিত্রের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। সর্বোত্তম আদর্শের বাস্তবায়নকারী ও প্রশিক্ষক হিসেবেই তাঁকে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

সমাজে যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী, তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতেন মহানবী (সা)। তিনি বিনয়ীসুলভ আচরণ প্রদর্শন করার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের উপদেশ দিতেন, আচার-ব্যবহারে অযথা রাগ ও ক্রোধ থেকে সর্বদা বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। তিনি মানুষকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চাসনে আসীন করেন আর যে অহংকারী হয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন।' (মিশকাত)

মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে বিধর্মীরাও আশাতীত সুন্দর কোমল আচরণ লাভ করতেন। তিনি এতই নমনীয় ও কোমলতর ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন যে তাঁর পবিত্র সংস্রব কিংবা সামান্যতম সুদৃষ্টির কারণেও অনুসারীরা তাঁকে প্রাণাধিক ভালোবাসত এবং মনে-প্রাণে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। তাঁর কোমল ব্যবহার সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'নবী করিম (সা) কঠোর ভাষী ছিলেন না, এমনকি প্রয়োজনেও তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতেন না। প্রতিশোধ প্রবণতা তাঁর মধ্যে আদৌ ছিল না।

মন্দের প্রতিবাদ মহানবী মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং মন্দের বিনিময়ে তিনি উত্তম আচরণ করতেন। সব বিষয়েই তিনি ক্ষমাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি এতটা বিনয়ী ছিলেন যে কথা বলার সময় কারও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথা বলতেন না। কোনো অশোভন বিষয় উল্লেখ করতেন না। মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন ও সদালাপ করতেন। তাঁর মধুর আচরণে সবাই অভিভূত হতো। তাঁর অভিভাষণ শুনে জনসাধারণ অশ্রু সংবরণ করতে পারত না। তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'দয়ালু প্রভু আল্লাহর ইবাদত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করো, সালামের বহুল প্রচলন করো এবং এসব কাজের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করো।' একদা এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-কে ইসলামে সবচেয়ে ভালো কাজ কোনটি প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে জানালেন, 'অভুক্তকে খাওয়ানো আর চেনা-অচেনা সবাইকেই সালাম করা।' (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবী বহুলাংশেই স্বাবলম্বী ছিলেন। নিজের প্রয়োজনে কারও ওপর নির্ভরশীল হতেন না। নিজ হাতে জুতা মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, দুধ দোহন করতেন। সেবকদের কাজে সহায়তা করে আটা পিষতেন। নিজ হাতে রুটি তৈরি করে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে খেতেন। নিজে হাটবাজার থেকে সওদা করে নিয়ে আসতেন। পরিবারের কেউ কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন।

তাঁর পারিবারিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে অবস্থানকালে পরিবারের কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি নামাজের জন্য উঠে যেতেন।' হযরত আনাস (রা) বলেছেন, 'পরিবারের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবণ হিসেবে নবী করিম (সা) থেকে বেশি অগ্রগামী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। এক ভাগ ইবাদত-বন্দেগি করতেন। অন্য ভাগ পরিবার-পরিজনের গৃহকর্মের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। আর এক ভাগ সময় তিনি নিঃস্ব-দুস্থজনদের জনসেবায় ব্যয় করতেন। কোনো জরুরি অবস্থা দেখা না দিলে সাধারণত এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটত না।

বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনাচরণ, কথামালা ও ইঙ্গিতাদি সম্বলিত পবিত্র হাদিসের নির্যাসকে এক কথায় 'মানবতা'ও বলা যায়। এ মানবতা সর্বজনীন, তা আল্লাহর কালাম কুরআনেরই বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ। মহানবী (সা)-এর বাণীর সর্বজনীনতার আওতায় গোটা বিশ্ব- জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, নিসর্গজগত তাবৎ মাখলুকাত কল্যাণ ও শান্তির আশ্বাস পাচ্ছে। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এ সর্বজনীন জীবন দর্শনের শান্তির ছায়াবৃক্ষ।

মহানবী (সা)-কে শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য রাসূল রূপে মনে করার অবকাশ নেই; কেবল মানবজাতির ত্রাণকর্তারূপে দেখাটাও ঠিক হবে না। সারা সৃষ্টিজগতের জন্য কল্যাণ ও শান্তির শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহী, বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি। এটা কোনো মানবীয় দাবী বা অতিশয়োক্তি নয়, মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণায় এ সত্যই উচ্চারিত হয়েছে। আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)।

মুহাম্মদ (সা) হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জন্মের পর হতেই তাঁর মাঝে বিরাজ করছিলো সর্বোত্তম চরিত্র মাধুরী, সর্বোত্তম আদর্শ, সর্বোত্তম মহৎ মানুষ ও সর্বোত্তম প্রতিবেশী ইত্যাকার মহত্তম গুণ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বভাব ছিলো কলুষতা, কাঠিন্য, কর্কশতা ও অহমিকামুক্ত। অনুক্ষণ তিনি ছিলেন দায়শীল, শ্রদ্ধাশীল সহানুভূতিশীল ও ঔদার্যশীল এবং নিষ্কলুষ নির্ভেজাল। অধিকন্তু পরনিন্দা, অশ্লীল বাক্য কখনই তার পবিত্র মুখ হতে নিঃসৃত হয়নি। বিশ্ববাসী সকলের নিমিত্ত নমুনা ও মহান আদর্শ। মহানবী (সা)-এর সর্বজনীন কল্যাণমুখী আচরণ ও কর্মকাণ্ড মানবিক একাত্মতার সর্বোচ্চ উদাহরণ হিসেবে নন্দিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ রাসূলরূপে অনুপম চরিত্র মাহাত্ম্য ছিলো তার মহিমার ভূষণ। এ জন্য আদর্শিক কারণে তাঁর শত্রু বা ভিন্ন মতাবলম্বীরাও তাকে বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয় প্রতীক হিসেবে সম্মান জানিয়েছে। রাসূল (সা)-এর আগমন যে গোটা মানবজাতির তথা সৃষ্টি জগতের জন্য কল্যাণবহ, এ কথাটি ভিন্ন মতের তাত্ত্বিক কিংবা মূল্যায়নকারীরা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন। এ এক অনিবার্য অর্জন, বিজয়।

## রাসূল (সা)-এর সততা

সততা উত্তম চরিত্রের পূর্বশর্ত। সততা উত্তম আদর্শ। সততার মাঝেই নিহিত আছে ইহকালিন সাফল্য ও পরকালের নাজাত। বলা বাহুল্য, জন্ম হতে মৃত্যু অবধি রাসূল (সা) হলেন সততার মূর্ত প্রতীক। যার দরুণ মক্কার কাফির-মুশরিক সকলের কাছে তিনি আস-সাদিক তথা সত্যবাদী নামে পরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মক্কার কাফের গোষ্ঠী ছিলো তাঁর ঘোরতর শত্রু। তাকে হত্যা করে ইসলামের বিলুপ্তির জন্য তারা চেষ্টা করত। এতদসত্ত্বেও তাদের ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখার সর্বাধিক বিশ্বস্ত বলে তাকেই জ্ঞান করতো। মহানবী (সা)-সততার কারণেই মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই মহানবীর সততা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের একান্ত অপরিহার্য।

## রাসূল (সা)-এর উদারতা

মহানবী (সা)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ হলো, উদারতা। ইসলাম আবির্ভাবের পর দুনিয়ার বুক থেকে এ গুণটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য বিধর্মীরা বহু চেষ্টা করেছে। এমনকি প্রিয় নবীজির উপর নৃশংস নির্যাতনও চালিয়েছে তারা। তারপরও তাদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার, ছিলেন মহৎপ্রাণ। কখনো বদদোয়া করেননি। তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন। সারা জাহানের জন্য রহমত। একবার উহুদ প্রান্তরে কাফেরদের তরবারির আঘাতে মহানবী (সা)-এর পবিত্র দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো। বর্শার ফলা শিরস্ত্রাণ ভেদ করে মাথায় আঘাত হেনেছিলো। দাঁত মুবারক শহিদ হয়েছিলো। কিন্তু সেই করুণ মুহূর্তেও তিনি ঔদার্য ও ক্ষমার আদর্শ ত্যাগ করেননি। বরং কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে এই বলে দোয়া করলেন, 'হে রাব্বুল আলামিন! ওদের ক্ষমা করে দাও। এরা তো অবুঝ।' তায়েফে ইসলাম প্রচারে গিয়ে পাথরের আঘাতে আহত হলেন মহানবী। তারপরও বদ দোয়া করলেন না। বললেন, হে আল্লাহ এদের ক্ষমা করে দিন। এরা যা করেছে না বুঝে। এদেরকে যদি আপনি ধ্বংস করে দেন, তাহলে কার কাছে আমি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাব।

## রাসূল (সা)-এর সহিষ্ণুতা

মহানবী (সা)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অবস্থা এমন ছিলো যে, সমস্ত সাহাবায় কেরামদের ধৈর্যও একত্রে তাঁর সমকক্ষ হবে না। এর একটি নমুনা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন, 'একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিলো। সাহাবিরা এ কাণ্ড দেখে রাগে রোষে তেড়ে এলেন। রাসূল (সা) তাদের থামিয়ে বললেন, 'তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। যেখানে সে পেশাব করেছে, তাতে পানি ঢেলে দাও। স্মরণ রেখো, তোমাদের আসানী সৃষ্টিকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। দুর্বিষহ বিড়ম্বনা সৃষ্টিকারী হিসেবে নয়।' (বুখারি, কিতাবুল অজু)

## রাসূল (সা)-এর বদান্যতা

বদান্যতা-দানশীলতা একটি মহৎ গুণ। এর শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন মহানবী (সা)-এর মাঝেই ঘটেছিলো। মহানবী (সা) নিতান্তই দরিদ্র্য ও অসহায়ের ন্যায় দিনাতিপাত করতেন। তথাপি পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাহের দান-দক্ষিণা তাঁর ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে তিরমিযী শরিফে। নবীজি (সা)-এর কাছে একবার নব্বই হাজার দিরহাম আসলে তিনি একটি মাদুরের উপর বসে সমুদয় দিরহাম বণ্টন করে দিলেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পরক্ষণেই এক

ভিখারি এসে হাজির। নবী কারিম (সা) বললেন, 'আমার কাছে এখন কিছুই নেই। তাই আমার নাম বলে কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে নাও। পরে আমি তা পরিশোধ করে দিবো।' (খাসায়েলে নববী)

## ইয়াতিম-অসহায়দের প্রতি দয়া

রাসূল (সা) ইয়াতিম ও অসহায়দের প্রতি অপরিসীম দয়া-অনুকম্পা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। বহু অনাথের মুখে তিনি মধুর হাসি ফুটিয়েছেন। একবার ঈদগাহে যাওয়ার পথে ইয়াতিম এক বাচ্চাকে কাঁদতে দেখে প্রিয় নবীজী তাকে আদর দিয়ে দুঃখ-দুর্দশার কথা জিজ্ঞেস করলেন। সব শুনে রাসূল (সা) তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলেন। গোসল করিয়ে সুন্দর কাপড় পরিয়ে ঈদগাহে নিয়ে গেলেন। এরপর তাকে বললেন, 'হে বৎস! আমি যদি তোমার বাবা হই, আয়েশা যদি তোমার মা হয় আর ফাতেমা যদি তোমার বোন হয়, তাহলে কি তুমি সন্তুষ্ট?' ছেলেটি সমস্বরে জবাব দিলো, হ্যাঁ, অবশ্যই। এবার তার রসনায় আনন্দের হাসি বিকশিত হলো।

## অমুসলিমদের প্রতি সদাচার

রাসূল (সা) মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যেরূপ সদাচারণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন, তদ্রুপ অমুসলিম বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও করতেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি সৎ মনোভাব প্রকাশ করতেন। একবার এক ইহুদি আল্লাহর হাবিবকে মারতে এসে তার মেহমান বনে গেলো। রাতে রাসূল (সা) যথাসাধ্য আপ্যায়ন করে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু ইহুদি লোকটি বিছানায় পায়খানা করে চলে গেলো। সকালে হুজুর (সা) তার কোনো সন্ধান পেলেন না। রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে গেলো। আফসোস আর আক্ষেপ করে বলতেছিলেন, 'হায়! আমি বুঝি তার যথাসাধ্য আপ্যায়ন করতে পারিনি'। এমনিভাবে একবার এক বেদুঈন এসে প্রিয়নবী (সা)-এর চাদর ধরে এতো জোরে টনতে লাগলো যে, গলায় ফাঁস লাগার উপক্রম হলো এবং জোর গলায় বলতে লাগলো, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু দাও'। রাসূল (সা) তার দিকে ফিরে হেসে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারি, মুসলিম)

## জীবজন্তুর প্রতি সদাচার

মহানবী (সা) শুধু মানুষের প্রতিই সদাচারণ করেছেন, এমন নয়। বরং তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্ট অন্যান্য প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রতিও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সদাচারণ প্রদর্শন করতেন। একবার এক সফরে দু'জন সাহাবি একটি পাখির বাসা থেকে দুটি পাখির ছানা নিয়ে এলেন। মা পাখিটি তার বাচ্চার সঙ্গে

সঙ্গে করুণ সুরে মুক্তির আবেদন জানাতে লাগলো। প্রিয় নবীজী এ অবস্থা দেখে বললেন, 'এ পাখি ধরে কেনো এই মা পাখিটাকে অস্থির করে তুলেছ? বাচ্চা দুটি ছেড়ে দাও। উভয়ে বাচ্চা দুটি ছেড়ে দিল। (সিরাতুন্নবী: ৬/২৪১) জীবজন্তুর প্রতি দয়া, অনুগ্রহ, তাদের দানা-পানির ব্যবস্থা এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেয়ার হুকুম দিয়েছেন।

## শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে রাসূল (সা)

পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে, মানবজাতির মধ্যে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য। এর ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলে ভ্রাতৃত্ববোধ, বিলীন হয়ে যায় তাদের মধ্যকার পারস্পরিক মায়ামমতা, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ মধুর সম্পর্ক। তাদের জীবনে নেমে আসে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যের ঘোর অন্ধকার। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত প্রিয়নবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে গোটা পৃথিবী শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যে নিমজ্জিত ছিলো। এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছিলো চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র পর্যায়ে যুদ্ধংদেহী মনোভাব, এমনকি এর ফলে সামান্য কোনো ঘটনা নিয়ে প্রতিহিংসার কারণে বছরের পর বছর চালিয়ে যেত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। পৃথিবী থেকে শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করাই ছিলো মহানবীর দায়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে ইতিহাস সাক্ষী, মহানবী (সা)-এর সময়ে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানে কোনোরকম শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্য ছিলো না।

## মহানবী (সা)-এর আদর্শ সর্বজনীনতায় দিগন্তবিস্তৃত

যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল পরিক্রমায় যে মানুষ শোষিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত ছিলো, তাদের শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান ঘটলো মহানবীর আদর্শের মাধ্যমে। সৃষ্টি হলো ধর্ম-বর্ণ এবং আর্থসামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে সানন্দ সহাবস্থানের মানব পরিবেশ, বাস্তবে সর্বজনীনতা। পবিত্র কুরআনে যত সুন্দর, সত্য, সততা, মানবতা ও কল্যাণময় গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, তার নিখুঁত নিখাদ ও পরিপূর্ণ চিত্রায়ন ঘটেছিলো রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শে। মানব সমাজের উন্নতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও চারিত্রিক সকল ক্ষেত্রে গৌরবময় উত্তরণের পথই হলো অনুসরণীয় আদর্শ। আদর্শহীন কোনো জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে সমাদৃত হতে পারে না। সুতরাং মহানবীর আদর্শের পথেই হোক আমাদের নবযাত্রা। ♦

# রাসূল (সা)-এর উপর নির্যাতন ও হিজরতের সূচনা

**মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান**

সমস্ত যুক্তি, কৌশল ও আপোষ প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর আবু লাহাবের নেতৃত্বে কুরায়েশ নেতাদের মধ্য থেকে ২৫ জনের একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে এখন থেকে কঠোরতম নির্যাতন চালাতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ করা চলবে না। তারা দেখল যে, অন্য মুসলমানদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই। তারা অধিকাংশই সমাজের দুর্বল শ্রেণীর। আবু বকর, উছমান প্রমুখ যারা উচ্চ শ্রেণির আছেন, তারা ভদ্র মানুষ। দুষ্টদের অভদ্রতার সামনে তারা মুহাম্মাদকে রক্ষা করার ক্ষমতা

রাখেন না। সমস্যা হ'ল খোদ মুহাম্মাদ ও তাঁর চাচা আবু তালেবকে নিয়ে। এ দু'জনই অত্যন্ত সম্মানিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তাদের উপরে হস্তক্ষেপ করলে তাদের দু'টি গোত্র বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব ঝাঁপিয়ে পড়বে। যদিও তারা মুশরিক। সবদিক ভেবেচিন্তে তারা দুর্বল মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে মুহাম্মাদ (সা)-কে দৈহিকভাবে ও মানসিকভাবে অপদস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে (সূরা আহযাব আয়াত ২১)। তিনি আরো বলেন, 'অবশ্যই তুমি মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সূরা কলম, আয়াত ৪)

অধিকাংশ নবী-রাসূল বিভিন্ন প্রকার মুজিযা লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি মানুষের অন্তরসমূহ পরিবর্তন এবং আত্মাকে পবিত্র করে দিতেন চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে। এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) লিখেছেন, 'কোন ব্যক্তি যখন নবী করীম (সা)-এর সামনে এক বার আসত, সে ভীত হয়ে পড়ত। আর যে কেউ তাঁর পাশে এসে বসতো সে মহববতে আকৃষ্ট হয়ে যেত। (রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২২৬ পৃ.)

এই ছিলো মায়ার নবীর মায়াবী আচরণ। কিন্তু এরপরও মক্কার কাফেররা তাঁর উপরে আমানসিক নির্যাতন চালায়। রাসূল (সা)-এর উপরে কাফিরদের নির্যাতন ছিল দু'ধরনের। ১. মানসিক ২. দৈহিক।

**মানসিক নির্যাতন**

মানসিক নির্যাতন পরিকল্পিতভাবে রাসূল (সা)-এর উপরে নানা অপবাদ আরোপ করে মানসিকভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তাদের আরোপিত অপবাদসমূহ যেমন –

পাগল (সূরা, আয়াত ২৯), কবি (সূরা, ছাফফাত আয়াত ৩৫-৩৬), জাদুকর ও মিথ্যাবাদী (সূরা, ছোয়াদ আয়াত ৪), পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী (সূরা, আনফাল আয়াত ৩১), অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী (সূরা ফুরক্বান আয়াত ৪), মিথ্যা রটনাকারী (সূরা নাহল-আয়াত ১০১), ভবিষ্যদ্বক্তা (সূরা তূর আয়াত ২৯), পথভ্রষ্ট (সূরা তাত্বফীফ আয়াত ৩২), পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী ও জামা'আত বিভক্তকারী, জাদুগ্রস্ত (সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৪৭),

এই কথাগুলো তারা বলাবলি করে হাসি মজা করত।

**দৈহিক নির্যাতন**

মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি এরা রাসূল (সা)-এর উপর শারীরিক নির্যাতনও করত। নিম্নে কয়েকজনের নির্যাতন ও তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হল–

**রাসূলের উপর প্রতিবেশীদের অত্যাচার**

আবু লাহাব ছিল রাসূলের চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী। সে ও তার স্ত্রী ছাড়াও অন্যতম প্রতিবেশী ছিল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া, উক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব, আদী বিন হামরা ছাক্বাফী, ইবনুল আছদা আল-হুযালী। এদের মধ্যে কেবল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইনিই ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের অন্যতম খলীফা মারওয়ানের পিতা। বস্তুত মু'আবিয়া ও ইয়াযীদ বাদে তাঁর বংশধরগণই উমাইয়া খেলাফতের ধারানুক্রমিক খলিফা ছিলেন। ইনি ব্যতীত বাকীরা রাসূলের উপর নানাবিধ অত্যাচার চালায়। যেমন, তাদের বাড়ির যবেহ করা দুম্বা-ভেড়ার নাড়ি-ভুঁড়ি তারা রাসূলের বাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে মারত। তাদের বাড়ির আবর্জনাসমূহ রাসূলের রান্নাঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করত যাতে রান্না অবস্থায় সব তরকারি নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল সেগুলি কুড়িয়ে এনে দরজায় খাড়া হয়ে তাদের ডাক দিয়ে বলতেন, 'হে বনু আবদে মানাফ! এটা কেমন প্রতিবেশী সূলভ আচরণ?' এরপর তিনি সেগুলি দূরে ফেলে আসতেন।

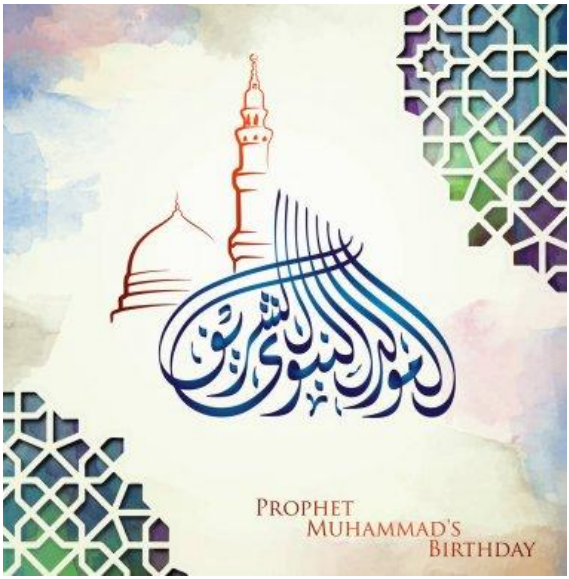


**কা'বা গৃহে সালাত আদায়ে নানারূপ বাধা সৃষ্টি**

প্রথম দিকে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'রাক'আত করে সালাত আদায়ের নিয়ম ছিল। প্রথম তিন বছর সকলে সেটা গোপনে আদায় করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা) এটা প্রকাশ্যে কা'বা গৃহে আদায় করতে থাকেন। একদিন তিনি ছালাত আদায় করছেন। এমন সময় আবু জাহেল গিয়ে তাঁকে ধমকের সুরে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এসব করতে নিষেধ করিনি'?

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পাল্টা ধমক দেন। এতে সে বলে, কিসের জোরে তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ। আল্লাহর কসম! মক্কার এই উপত্যকায় আমার বৈঠক সবচেয়ে বড়'। অর্থাৎ আমার দল সবচেয়ে বড়। (তিরমিযী হাদীস ৩৩৪৯)

তখন আল্লাহ সূরা আলাক্ব-এর নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন –

'কখনোই না। সত্য-সত্যই মানুষ সীমালংঘন করে'। 'এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে'। 'নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে'। 'আপনি কি তাকে (আবু জাহলকে) দেখেছেন যে নিষেধ করে'? 'এক বান্দাকে (রাসূলকে) যখন সে ছালাত আদায় করে'। 'আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে'। 'অথবা আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেয়'। 'আপনি কি দেখেছেন যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়'। 'সে কি জানেনা যে, (তার ভাল মানুষী ও মিথ্যাচার সবই) আল্লাহ দেখেন'। 'কখনোই না', যদি সে বিরত না হয়,

তবে আমি তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে কষে টান দেব'। 'মিথ্যুক পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ'। 'অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডাকুক'। 'আমরাও ডাকব আযাবের ফেরেশতাদের'। 'কখনোই না। আপনি তার কথা শুনবেন না। আপনি সিজদা করুন ও (আপনার প্রভুর) নৈকট্য তালাশ করুন'। (আলাক্ব আয়াত ৬-১৯)

আবু জাহল ও রাসূলের মধ্যকার এই ঘটনা স্মরণ করে এই আয়াত পাঠের পর পাঠক ও শ্রোতাকে সিজদা করার বিধান দেওয়া হয়েছে'। (মিশকাত হাদীস ১০২৪)

আরেক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা চত্বরে সালাত আদায় করছেন। এমন সময় দুরাচার ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব এসে সিজদারত অবস্থায় রাসূলের ঘাড়ের উপর পা দিয়ে এমন জোরে পিষ্ট করে দেয় যে, তাঁর চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। অনুরূপ আরেকদিন ছালাতরত অবস্থায় উক্ত ওক্ববা এসে তাঁর গলায় জোরে কাপড় পেঁচিয়ে ধরল, যাতে তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান। জনৈক ব্যক্তি চীৎকার করে গিয়ে এ খবর দিলে আবু বকর (রা) ছুটে এসে কাপড় খুলে দিলেন ও বদমায়েশ গুলিকে সরিয়ে দিলেন ও ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছ, যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ। অথচ তিনি স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছেন? এ সময় তারা রাসূলকে ছেড়ে আবুবকরকে বেদম প্রহার করে'। (বুখারী, হাদীস ৬৩৭৮)

শিস দেওয়া ও তালি বাজানো রাসূলুল্লাহ যখন কা'বায় গিয়ে ছালাত আদায় করতেন, তখন কাফের নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে কা'বা গৃহে আসত। অতঃপর ইবাদতের নাম করে তারা সেখানে জোরে জোরে তালি বাজাত ও শিস্ দিত। যাতে রাসূলের ছালাত ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো যায়। এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'আর কা'বার নিকটে তাদের ইবাদত বলতে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব (ক্বিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে) তোমরা নিজেদের কুফরীর আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর'। (আনফাল আয়াত ৩৫)

ইবনু আববাস (রা) বলেন, এতদ্ব্যতীত আবু জাহেল অন্যান্যদেরকে প্ররোচিত করেছিল যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমরা হৈ-হুল্লোড় ও হট্টগোল করবে, যাতে কেউ তার তেলাওয়াত শুনতে না পায়। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়– 'আর কাফেররা বলে যে, তোমরা এ কুরআন শুনোনা এবং এর তেলাওয়াত কালে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী হও'। 'আমরা

অবশ্যই কাফিরদের কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমরা অবশ্যই তাদের কাজের হীনতম বদলা নেব'। (হামীম সাজদাহ আয়াত ২৬-২৭)

আজকাল মসজিদে ছালাতের সময় বা রামাযানে সাহরীর পূর্বে যারা জোরে জোরে রেডিও ও ক্যাসেট বাজায়, কিংবা মাইকবাজি করে ও হট্টগোল করে, তারা সবাই সেদিনের মক্কার কাফেরদের অনুসরণ করে এবং তাদের শাস্তিও অনুরূপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেরূপ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে হোটেলে ও বাজারে ব্যস্ততার সময় মাইকে কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট চালানোও ঠিক নয়। কেননা কুরআন শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া শর্ত। অথচ ঐ সময় মনোযোগ দেওয়া যায় না।

**রাস্তায় ছেলে-ছোকরাদের লেলিয়ে দেওয়া**

উপরে বর্ণিত অত্যাচার সমূহের সাথে যোগ হ'ল একটি নিষ্ঠুরতম অত্যাচার। সেটি হ'ল নেতাদের কারসাজিতে ছেলে-ছোকরাদের অত্যাচার। যেহেতু ছোট ছেলেদের সাত খুন মাফ। তাই নেতারা তাদের কাজে লাগালো। আধুনিক পরিভাষায় নেতারা হ'ল গডফাদার এবং ছোকরারা হ'ল টিন এজার সন্ত্রাসী।

আল্লাহর রাসূল  যখন রাস্তায় বেরোতেন, তখনই আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ছোকরার দল ছুটে আসত। আল্লাহর রাসূল ওদের সালাম দিতেন। ওরা পাল্টা গালি দিত। তিনি ওদের উপদেশ দিতেন। ওরা তখন হি হি করে অট্টহাস্য

করত। এভাবে কোন এক পর্যায়ে যখন ওরা রাসূলের দিকে ঢিল ছুঁড়ে মারা শুরু করত, তখন রাসূল আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিতেন। তখন ছোকরারা চলে যেত। আবু সুফিয়ান বাহ্যিক সৌজন্য বজায় রাখতেন। সম্ভবত এরই প্রতিদান স্বরূপ মক্কা বিজয়ের রাতে সুফিয়ান গোপন অভিযানে এসে ধরা পড়লে রাসূল তাকে মাফ করে দেন এবং ঘোষণা দেন, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে, সে ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে।(আর- রাহীকুল মাখতুম পৃ. ৪০১)

**আবু লাহাব ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতন**

রাসূল (সা) কম-বেশি সকল কাফির- মুশরিক নেতাদের পক্ষ থেকে নির্যাতিত হয়েছেন। তন্মধ্যে আবু লাহাব অন্যতম। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয্যা। সে ছিল আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। সে লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'আবু লাহাব' অর্থাৎ 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওয়ালা' বলা হতো। এছাড়া 'আব্দুল ওযযা' নাম কুরআনে থাকাটা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। বিধায় পবিত্র কুরআনে তার আসল নাম বর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আপন চাচা ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল। তার পরেও সে নবী করীম (সা)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ নানা রকম নির্যাতন করত।

একদা নবী করীম (সা) ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আহবান জানালেন, হে বনু ফিহর! হে বনু আদী! এভাবে কুরায়শদের বিভিন্ন গোত্রকে। এতে সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হ'ল। যে পারেনি সে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল কি ব্যাপার জানার জন্য। কুরায়েশরা এসে হাযির হ'ল, আবু লাহাবও তাদের সাথে ছিল। অতঃপর নবী করীম (সা) বললেন, যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে শত্রুসৈন্য অবস্থান করছে। ওরা যেকোন সময় তোমাদের উপর হামলা করতে প্রস্তুত, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব।

কারণ আপনাকে আমরা কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। আবু লাহাব বলল, তুমি ধ্বংস হও। একথা বলার জন্য তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছ? তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। যাতে বলা হয়, 'আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও'।

অন্যত্র আছে, ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর রাসূল (সা)-কে মারার জন্য আবু লাহাব একটি পাথরও তুলেছিল। (আর-রাহীকুল মাখতূম, আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, ১১০ পৃ.)

তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুওয়াত পূর্বকালে রাসূল (সা) এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু নবী হওয়ার পরে সে তার ছেলেদেরকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে এই দুই মেয়ের সাথেই একের পর এক ওসমান (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। (সায়্যিদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলাযিল কুর'আন ৩/২৮২পৃ.)

রাসূল (সা)-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (উপনাম ত্বাইয়েব বা তাহের) মারা গেলে আবু লাহাব খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ এখন লেজকাটা নির্বংশ হয়ে গেল। যার প্রেক্ষিতে সূরা কাওছার নাযিল হয়। (বুখারী, মিশকাত হাদীস ৫৭৭৮)

হজ্জের মৌসুমে আবু লাহাব রাসূল (সা)-এর পিছে লেগে থাকত। যেখানেই রাসূল (সা) দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাঁকে গালি দিয়ে লোকদেরকে ভাগিয়ে দিত এবং বলত, এ লোকটি বিধর্মী মিথ্যাবাদী তোমরা এর কথা বিশ্বাস করো না'। (আহমাদ হাদীস ১৬০৬৬)

এমনকি 'যুল মাজায' নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহ'লে সফলকাম হবে', তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে সে পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলের পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়। (ছহীহ ইবনু হিববান, হাকেম ২/৬১১)

এভাবে রাসূল (সা)-এর উপর সে একের পর এক নির্যাতন অব্যাহত রাখে। অবশেষে আবূ লাহাবের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবী গযব নেমে আসে। আবু লাহাবের মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও জঘন্যভাবে হয়। বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে নির্জন জায়গায় ফেলে আসে। সেখানে ধুকে ধুকে তার মৃত্যু হয়। তার লাশটি পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করেনি। শেষ পর্যন্ত দেহ পঁচতে শুরু করলে গর্ত খুঁড়ে চাকর দ্বারা পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে হেঁচড়ে সে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। (আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৫২-২৫৩ পৃ.)

আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া অথবা 'আওরা' ওরফে উম্মে জামীল অর্থাৎ সুন্দরের উৎস। সেও স্বামীর একান্ত সহযোগী ছিল এবং সর্বদা রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ও নিন্দাবাদে মুখর থাকত। চোগলখুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সংসারে বা সমাজে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে আরবদের পরিভাষায় খড়িবাহক বলা হতো। অর্থাৎ ঐ শুষ্ক কাঠ যাতে আগুন লাগালে দ্রুত আগুন বিস্তার করে।

আবু লাহাবের স্ত্রী এ কাজটিই করত আড়ালে থেকে। সে কারণে আল্লাহ তাকেও স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। আবু লাহাবের স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। সে রাসূল (সা)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার সম্মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখত। যাতে রাসূল (সা) কষ্ট পান। এই মহিলা ছিল একজন কবি।

সে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলত। সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে পাথর খণ্ড নিয়ে রাসূল (সা)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা চত্বরে গমন করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (সা) সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পায়নি। তাই পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসা মূলক কবিতা বলে ফিরে আসে। উক্ত কবিতায় সে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলে। যেমন 'নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি। তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি। তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি'। (বুখারী, মিশকাত হাদীস ৫৭৭৮)

আবুবকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? জবাবে তিনি বললেন, না, দেখতে পায়নি। আল্লাহ আমার জন্য তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।

রাসূল যখন সালাত আদায় করতেন তখন বকরীর নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারত যে, সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়ত। আবার কখনও কখনও উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো হ'লে সে হাঁড়িতে নিক্ষেপ করত। রাসূল (সা) তাদের অত্যাচারে ঘরের ভিতরে নিরাপদে ছালাত আদায় করার জন্য একটি জায়গা করে নিয়েছিলেন। (ইবনে হিশাম ১/৪১৬ পৃ.)

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলায় একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহন করে আনতে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেন এবং হালাক করে দেয়' (কুরতুবী)।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (সা)-এর নিকটবর্তী হয়ে বলল, আমি নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। (নাজম আয়াত ১-২)

এই আয়াত দু'টিকে অস্বীকার করি বলে একটা হেঁচকা টানে রাসূল (সা)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে দিল এবং থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রাসূল (সা) তখন

তাকে বদ দো'আ করে বললেন, 'আল্লাহ তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও'। কিছুদিন পরে উতায়বা সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে 'যারক্বা' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘকে সে তাদের চারপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে।

এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে দো'আ করেছিল'। পরদিন সকালে বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ধরে নিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করল। এভাবে আবু লাহাব, তার স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল ও তাদের পুত্র উতায়বার নির্যাতনের প্রতিকার মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই কার্যকর হ'ল। (শায়খ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ, মুখতাছার সীরাতে রাসূল, ১/১৩৫ পৃ.)

**আবু জাহল কর্তৃক অত্যাচার ও পরিণতি**

ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল আবু জাহল। তার মূল নাম আমর ইবনে হিশাম। জাহেলী যুগে তার উপাধি ছিল আবুল হাকাম। অর্থাৎ জ্ঞানের পিতা। তার আচরণের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম রাখেন আবু জাহল অর্থাৎ মূর্খের পিতা। (ইবনে হিশাম ১/৩২০ পৃ.)

আবু হুরায়রা (রা) হ'তে বর্ণিত, কুরায়শ সরদারদের নিকটে একদিন আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ আপনাদের সামনে নিজের চেহারায় ধূলো লাগিয়ে রাখে কি? কুরায়শদের সরদাররা বলল, হ্যাঁ। আবু জাহল বলল, লাত ও ওয্যার শপথ! আমি যদি তাঁকে এ অবস্থায় দেখি, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেব, তাঁর চেহারা মাটিতে হেঁচড়াব। এরপর রাসূল (সা)-কে ছালাত আদায় করতে দেখে তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য সে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখল যে, আবু জাহল চিৎপটাং হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করছে এবং চীৎকার করে বলছে বাঁচাও বাঁচাও। তার পরিচিত লোকেরা

জিজ্ঞেস করল, আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখলাম, আমার ও মুহাম্মাদের মধ্যখানে আগুনের একটি পরিখা। ভয়াবহ সে আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাসূল (সা) এ কথা শুনে বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তবে ফেরেশতা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিড়ে ফেলত'। (মুসলিম হাদীস ২৭৯৭)

একবার আবু জাহল বলল, হে কুরায়শ ভাইয়েরা! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা ও উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না? আমাদের পিতা ও পিতামহকে সারাক্ষণ গালমন্দ করেই চলেছে। এ কারণে আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি একটি ভারী পাথর নিয়ে বসে থাকব, মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে, তখন সে পাথর দিয়ে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হ'লে তোমরা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখবে, ইচ্ছে হ'লে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

এরপর আবদে মানাফ আমার সাথে যেরূপ ইচ্ছে ব্যবহার করবে এতে আমার কোন পরোয়া নেই। কুরায়শরা প্রস্তাব শুনার পর বলল, কোন্ ব্যাপারে আমরা তোমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছি? তোমাকে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তুমি যা করতে চাও করতে পার। সকালে আবু জাহল একটি ভারী পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। কুরায়শরা একে একে সমবেত হয়ে আবু জাহলের তৎপরতা দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল।

রাসূল (সা) যথারীতি হাযির হয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন আবু জাহল পাথর নিয়ে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু পরক্ষণে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এলো। তার হাত যেন পাথরের সাথে আটকে রইল। কুরায়শদের কয়েকজন লোক তার কাছে এসে বলল, আবুল হাকাম! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি যে কথা রাতে বলেছিলাম, তা করতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু পৌঁছাতেই দেখতে পেলাম, মুহাম্মাদ এবং আমার মাঝখানে একটা উট এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম! অত বড় লম্বা ঘাঁড় ও দাঁতবিশিষ্ট উট আমি কখনো দেখিনি। উটটি আমাকে হামলা করতে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেছেন, উটের ছদ্মবেশে ছিলেন জিবরীল (আ) আবু জাহল যদি কাছে আসত, তবে তাকে পাকড়াও করা হতো। (ইবনে হিশাম ১/২৯৮-২৯৯ পৃ.)

আবু জাহল একদিন ছাফা পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গালমন্দ করে ও শাসিয়ে দেয়। রাসূল (সা) নীরব রইলেন, কোন কথা

বললেন না। এরপর আবু জাহল নবী করীম (সা)-এর মাথায় এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করল। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বের হ'ল। এরপর আবু জাহল কা'বার সামনে কুরায়শদের মজলিসে গিয়ে বসল। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ানের একজন দাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। ইতিমধ্যে হামযাহ শিকার করে ফিরছিলেন। সেই দাসী তাকে ঘটনা শুনালেন।

হামযাহ ঘটনা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন কুরায়েশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তিনি দেরী না করে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আবু জাহলকে যেখানে পাব সেখানেই আঘাত করব। এরপর তিনি সোজা কা'বা ঘরে আবু জাহলের সামনে গিয়ে বললেন, ওরে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগকারী! তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছিস, অথচ আমিও তাঁর প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী?

এ কথা বলে হাতের ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, মাথায় বড় ধরনের জখম হয়ে গেল। এ ঘটনার সাথে সাথে আবু জাহলের গোত্র বনু মাখযূম এবং হামযাহ (রা)-এর গোত্র বনু হাশেমের লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো। আবু জাহল সকলকে এই বলে থামিয়ে দিল যে, আবু আমরকে কিছু বল না, আমি তার ভাতিজাকে আসলেই খুব খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছিলাম। (ইবনে হিশাম ১/২৯১-২৯২ পৃ.)

ইয়াসির বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র মুসলমান হন। ফলে তাঁদের উপরে যে ধরনের অমানুসিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। আবু জাহলের নির্দেশে বনু মাখযূমের এই ক্রীতদাস মুসলিম পরিবারের উপরে নৃশংসতম শাস্তি নেমে আসে। তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে ফেলে রেখে নানাভাবে নির্যাতন করা হতো। একদিন চলার পথে তাদের এই শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। ইয়াসিরের দুই পায়ে দু'টি রশি বেঁধে দু'দিকে দু'টি উটের পায়ে উক্ত রশির অন্য প্রান্ত বেঁধে দিয়ে উট দু'টিকে দু'দিকে জোরে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়। তাতে জোরে হেঁচকা টানে ইয়াসিরের দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি শাহাদতবরণ করেন। (ইবনে হিশাম ১/৩২০ পৃ.)

অতঃপর পাষাণ হৃদয় আবু জাহল নিজ হাতে ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ। অতঃপর তাদের একমাত্র পুত্র আম্মারের উপরে শুরু হয় অবর্ণনীয় নির্যাতনের পালা। তাকে উত্তপ্ত কংকরময় বালুর উপরে হাত, পা বেঁধে পাথর

চাপা দিয়ে ফেলে রেখে নির্যাতন করা হয়। একদিন আম্মারকে পানিতে চুবিয়ে আধামরা অবস্থায় উঠিয়ে বলা হ'ল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদকে গালি না দিবে এবং লাত, মানাত ও উযযা দেব-দেবীর প্রশংসা না করবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন।

পরেই তিনি রাসূল (সা)-এর দরবারে গিয়ে কান্না-জড়িত কণ্ঠে সব ঘটনা খুলে বললেন ও আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় –

ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার জন্য কোন চিন্তা নেই)' (সূরা নাহল আয়াত ১০৬)।

পরে আবুবকর (রা) আম্মার বিন ইয়াসিরকে তার মনিবের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। আম্মার ঐ সময় আবুবকর (রা)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেন, তার শুরু ছিল নিম্নরূপ :

'আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন আবুবকর (রা)-কে বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ'তে এবং লাঞ্ছিত করুন আবু ফাকীহাহ ও আবু জাহলকে'। (সীরাতে ইবনে ইসহাক ১/১৯১)

রাসূল ও তাঁর সাথীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করার পরিণাম বদর প্রান্তরে এমন ভয়াবহ হবে আবু জাহল তা ভাবতে পারেনি। দুর্বৃত্ত নেতার চারিদিকে ছিল তীর ও তলোয়ার বাহিনীর পাহারা। মুসলিম মুজাহিদের প্রচণ্ড হামলায় সেই পাহারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানরা লক্ষ্য করলেন যে, আবু জাহল একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহী। তার মৃত্যু তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে আমি মুসলমানদের কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন আনছার কিশোর। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ একজন চুপিসারে বলল, চাচাজান আবু জাহল কে? আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, তুমি তার কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নবী করীম (সা)-কে গালি দিয়ে কষ্ট দেয়। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকে ততক্ষণ আমি তার সাথে লড়াই করে যাব।

বর্ণণাকারী (আব্দুর রহমান বিন আওফ) একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অন্য আনছার কিশোরও চুপিসারে একই কথা বলল। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি

আবু জাহলকে লোকদের মাঝে বিচরণ করতে দেখলাম। আমি আনছার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ঐ দেখো তোমাদের শিকার। এ কথা শুনামাত্র উভয়ে আবু জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল।

এরপর তারা নবী করীম (সা)-এর নিকটে এসে উপস্থিত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছ? উভয়ে বলল, আমি হত্যা করেছি। তিনি (সা) বললেন, তোমরা কি তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না।

নবী করীম (সা) তাদের তলোয়ার দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই হত্যা করেছ। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু জাহলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহকে প্রদান করলেন। তাদের একজনের নাম ছিল মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ ও অপরজনের নাম মু'আবিবয ইবনে আফরা। (মুসলিম হাদীস ১৭৫২)

এরপর নবী করীম বললেন, চলো আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা রাসূল (সা)-কে আবু জাহলের লাশের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এ হচ্ছে এই উম্মাতের ফেরাঊন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু জাহল, ওতবা ইবনে রাবী'আ, শায়বা ইবনে রাবী'আ, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং উকবা ইবনে আবু মুঈত্বসহ অন্যান্য কাফেরের নাম ধরে ধরে বদদো'আ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) বলেন, একদিন রাসূল বায়তুল্লাহর পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার নির্দেশে ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুঁড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে শত্রুরা দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই সময় কিভাবে এই দুঃসংবাদ ফাতেমার কানে পৌঁছল। তিনি দৌঁড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে কষ্টকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন– হে আল্লাহ! তুমি কুরায়শকে ধরো (তিনবার)! হে আল্লাহ! তুমি আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহলকে ধরো। হে আল্লাহ! তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, ওয়ালীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্বা বিন আবী মু'ঈত্ব এবং ওমারাহ বিন অলীদকে ধরো'। ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি'। (মিশকাত হাদীস– ৫৮৪৭)

**হিজরতের সূচনা**

হিজরি সনের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর মৌলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয়নবী মুহাম্মদের (সা) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনা শরিফে গমনের ঐতিহাসিক ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে হিজরত যুগান্তকারী ঘটনা। বৈশ্বিক ইতিহাসেও হিজরত সর্বাধিক তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা।

এটি দ্বীন ও মানবতার বৃহত্তম স্বার্থে ত্যাগ, বিসর্জনের এক সাহসী পদক্ষেপ। মহানবী (সা) ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন। তখন দাওয়াত ও সঠিক পথ-নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব পেয়ে তিনি আল্লাহর অস্বীকারকারীদের এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষেরা বিরোধিতা শুরু করেছিলেন।

তাই তিনি গোপনে তিন বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহর নির্দেশে সাফা পাহাড়ে প্রকাশ্যে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন থেকে শুরু হয়েছিল মহানবীর ওপর প্রচণ্ড নির্যাতনের ধারা। পথে-প্রান্তরে তাকে নিদারুণভাবে আহত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হতো। এরপরও অত্যন্ত ধৈর্য ও পরম সাহসিকতার সঙ্গে মহানবী (সা) তাঁর মিশন এগিয়ে নিতে থাকেন।

'দারুন নদওয়া' নামে মক্কার কাফিরদের একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে জাতীয় সমস্যাবলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও শলাপরামর্শ করা হতো। প্রতিটি গোত্রের প্রধান ব্যক্তিরা তাতে উপস্থিত থাকতো। মক্কার কাফেররা একদিন সর্বশেষ নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তাদের 'নদওয়া' গৃহে সব গোত্রপতির বৈঠক আহ্বান করে।

বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের মতামত আসে। কেউ পরামর্শ দিলো, 'মুহাম্মদ (সা)-কে শৃঙ্খলিত করে কোনো ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা উচিত।' পরক্ষণে আবার কেউ মতামত দিলো, 'মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীরা হয়তো আমাদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং এর ফলে আমাদের পরাজয়ও ঘটতে পারে।' কিন্তু ওই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান হয়।

কেউ কেউ বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, 'তাকে নির্বাসিত করা হোক।' কিন্তু তিনি যেখানে যাবেন, সেখানেই তার অনুগামী বাড়তে থাকবে। আন্দোলনও যথারীতি সামনে অগ্রসর হবে– আশঙ্কায় ওই পরামর্শও নাকচ করা হলো।

সবশেষে আবু জাহেল ভিন্ন রকম পরামর্শ দিলো, 'নানা কৌশল করে আমরা মুহাম্মদকে আটকাতে চেয়েছি। কিন্তু সম্ভব হলো না। বরং তার কাজ বেড়েই চলছে। তাই মুহাম্মদকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াই সবচেয়ে উচিত হবে।

আবু জাহেল আরও বললো, 'প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচন করা হবে, তারা সবাই একযোগে রাসূল (সা)-এর ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলবে। ফলে তার রক্তপণ সব গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর বনু হাশিম গোত্র সবার সঙ্গে একাকী লড়াই করে কিছুই করতে সক্ষম হবে না।'

সমবেত সবাই এ সিদ্ধান্তের ওপর সমর্থন ব্যক্ত করে। তারা জঘন্যতম কাজটা সম্পন্ন করতে প্রত্যেক গোত্রের শক্তিশালী যুবকদের নির্বাচন করে। এরপর ঘোষণা করে, মুহাম্মদকে যে জীবিত অথবা মৃত 'নদওয়া' গৃহে হাজির করতে পারবে, তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। মক্কার সব গোত্রের শক্তিশালী যুবকরা একত্রিত হয়ে শপথ নেয়, সেদিন রাতেই মুহাম্মদ (সা)-এর বাড়ি ঘেরাও করা হবে। সেদিনই তাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলেন, 'স্মরণ করো, কাফিররা তোমাকে বন্দি বা হত্যা করার জন্য কিংবা নির্বাসিত করার চক্রান্ত করে। তারা চক্রান্ত করে; আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।' (সূরা আনফাল, আয়াত: ৩০)

তাদের সব নীলনকশা ও কূট-পরিকল্পনা মহান আল্লাহ নস্যাৎ করে দেন। রাতেই আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে এই চক্রান্তের কথা তার রাসূলকে জানিয়ে দেন। তাঁর প্রিয় নবী (সা)-কে তিনি হিজরতের আদেশ দিয়ে বলেন, 'হে নবী! মক্কার মানুষ আপনাকে চায় না। অন্যদিকে মদিনার মানুষ আপনার জন্য সীমাহীন আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। আপনি হিজরত করে মদিনায় চলে যান।'

হিজরতের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই প্রিয়নবী (সা) নিজের ঘরে ও নিজের বিছানায় আপন চাচাতো ভাই হযরত আলী (রা)-কে রাখেন। এরপর প্রিয়সঙ্গী আবু বকর (রা)-কে নিয়ে মহানবী (সা) মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। রওনা হওয়ার মুহূর্তে বাইতুল্লাহর দিকে করুণ দৃষ্টিতে নবীজি বলেন, 'হে মক্কা! খোদার কসম, তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় শহর, আমার প্রতিপালকের কাছেও বেশি পছন্দের শহর তুমি। যদি তোমার অধিবাসীরা আমাকে বের করে না দিতো, আমি কখনো বের হতাম না।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৯২৫)

## মদিনার উদ্দেশে হিজরত

মহানবী (সা) আল্লাহ তাআলার আদেশ পেয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর মক্কা মুকাররামা থেকে মদিনার উদ্দেশে হিজরত করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ৮ রবিউল আওয়াল মদিনার পার্শ্ববর্তী কোবায় পৌঁছান

তিনি। ২৭ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১২ রবিউল আওয়াল মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছান মহানবী (সা)। প্রিয়নবী (সা)-এর হিজরতেরই স্মৃতিবহন করে আসছে আরবি হিজরি সন।

মদিনায় সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন রাসূল (সা)-এর প্রিয় সাহাবি মুসআব ইবনে উমাইর (রা)। আর মহানবী (সা) হিজরত করেন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। সাহাবাদের হিজরতের দুই মাস পর।

হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর (রা)। এছাড়াও আবু বকর (রা)-এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা এবং পথনির্দেশক আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত দুয়ালি ছিলেন। মদিনার উদ্দেশে তিনি রওনা দেন ২৭ সফর বৃহস্পতিবার। এটি বায়আতে আকাবার তিন মাস পর।

তিন দিন মক্কার 'গারে ছাওর' গুহায় গোপন থাকার পর সোমবার প্রথম রবিউল আউয়াল আবার রওনা দেন। সোমবার ১২ রবিউল আউয়ালে মদিনার তিনি নিকটবর্তী কুবা অঞ্চলে পৌঁছেন। সেখানে অবস্থান করে মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে মদিনার লোকজন তার আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। প্রতিদিন তারা সকাল থেকে সূর্যের তাপ প্রখর হওয়া পর্যন্ত মদিনার বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতেন। দূর দিগন্তে তাকিয়ে দেখতেন কোনো আগন্তুক আসছে কী না।

১৪ দিন কুবায় থেকে মহানবী (সা) ভরদুপুরে মদিনায় পৌঁছেন। মদিনার মানুষের মাঝে তখন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের জোয়ার নেমে আসে। তারা প্রিয়নবী (সা)-কে বরণ করে নিতে বিভিন্ন রকমের কবিতা আবৃত্তি করে। হৃদয়োৎসারিত উষ্ণতা দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষকে অভ্যর্থনা জানায়। (ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৩, পৃ. ১৮৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনায় যাওয়ার পর মক্কায় অবস্থানকারী দুর্বল ও অক্ষম মুমিন ছাড়া সবার ওপর হিজরত করা ফরজ ছিল। এটি তখন ঈমানের শর্ত ছিল। এই হিজরতকে কেন্দ্র করেই হযরত উমর (রা) তার খিলাফতকালে (১৭ হিজরিতে) হিজরি সনের কার্যক্রম চালু করেন।♦

# শেখ রাসেল

## যে প্রিয় নাম ভুলে না বাঙালি

**টুটুল রহমান**

কঠিন হিমালয় হয়তো থিরথির করে কেঁপে উঠতো। মমতার আলোকদ্যুতি ছড়ানো করুণ মুখটি থেকে যখন কয়েকটি মৃত্যু শব্দ আকাশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে তখন। সংশয়ে দুরুদুরু কাঁপা বুকের ছোট্ট বুকের আকুতি বারবার আকুতি আমি আমি আম্মুর কাছে যাবো। আমাকে আম্মুর কাছে নিয়ে চলো। মিথ্যেবাদী উন্মত্ত ঘাতক পাষণ্ড শঠের মতো বলেছিল চলো তোমাকে আম্মুর কাছে নিয়ে যাই। শিশু রাসেল কি আশ্বস্ত হয়েছিল? মায়ের স্নিগ্ধ আঁচলের তলে আবারও ভরে উঠবে তার দুষ্টামি ভরা শৈশব! মিথ্যাবাদী খুনি তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় দো-তালায়। বুলেটের নির্মম আঘাতে হত্যা করে। দোতালায় নেয়ার সময় ভয় পেয়ে বলেছিল আমাকে হাসু আপার কাছে পাঠিয়ে দাও। কোনো শব্দে কোনো বাক্যে এই হত্যাকাণ্ডের নির্মমতা বর্ণনা করা যাবে না। পুরো পৃথিবীতে স্তব্ধতা নেমে আসে। শোকের মহাকাব্যের পৃষ্ঠাগুলো একে একে উল্টাতে থাকে মহাকাল। শেখ রাসেল

শেখ হাসিনার পরম আদরের প্রিয় রাসেল। স্বর্গ থেকে নেমে আসার এক উজ্জ্বল দ্যুতি।

শেখ রাসেল বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের কোল আলো করে এসেছিলেন ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই দিনের বর্ণনা দেন এভাবে, '১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসায় আমার শোয়ার ঘরে। দোতলা তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করেছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নিচতলায় আমরা থাকি। উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিল রাত দেড়টায়... রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিলো ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেঝ ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেঝ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখবো, ফুফু বললেন তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালোচুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড় সড় হয়েছিলো রাসেল।'

নামকরণ নিয়ে তিনি লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু নিজে নাম বার্ট্রান্ড রাসেলের সাথে মিল রেখে শেখ রাসেলের নামকরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লেখক ছিল বার্ট্রান্ড রাসেল।

পিতাকে খুববেশি কাছে পাননি শেখ রাসেল। যতক্ষণ পেয়েছে কখনো গলা জড়িয়ে কখনো বিস্ময়সূচক নানা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুকে মাতিয়ে রেখেছেন। রাসেলের ছোট্ট ছোট্ট পায়ের নরম চিহ্ন, দুরন্তপনা মহাকালের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আজো ছড়িয়ে আছে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোড়ের বাড়িতে। রাসেলের বেশি সময় কেটেছে মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কাছে।

চঞ্চল ও পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান হওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু খুব ভালোবাসতেন শেখ রাসেলকে। তবে বেশি সময় শেখ মুজিবকে কাছে পাননি রাসেল। এ অল্প সময়ের মধ্যেই পিতা-পুত্রের এক অন্যরকম হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেখ রাসেল ছিলেন ভীষণ দুরন্ত। তার দুরন্তপনার সঙ্গী ছিল বাইসাইকেল। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ছাড়াই সাইকেলে করে স্কুলে যেতেন পাড়ার আর দশ জন সাধারণ ছেলের মতো। বাবাকে দেখতে না পেয়ে মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে আব্বা বলে সম্বোধন করতেন ছোট্ট রাসেল। এই চাপা কষ্ট ছোট্ট রাসেলের মতো তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও অনুভব করতেন। যা ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে।

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের পর থেকেই রাজবন্দি হিসেবে জেলে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি সে সময়ের একদিনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে। 'কারাগারের রোজনামচা'য় শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো।' কী উত্তর ওকে আমি দিবো। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম, ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, 'তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে

এসো।' ও কী বুঝতে চায়! কী করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে! দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনও বুঝতে শিখেনি। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।'

বাড়িতে বেশিরভাগ সময় শেখ হাসিনা ও রেহানার সঙ্গে সময় কাটাতেন রাসেল। তবে শেখ রেহানা ও মাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সংসার দেখাশোনা করতেন। এ সময়টায় রাসেলের একমাত্র সময় কাটানো ও খেলাধুলার সঙ্গী হন দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তিনি 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' বইয়ের ২১ পৃষ্ঠায় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার বিষয়ে লিখেছেন, 'আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আর আসতে চাইত না। খুবই কান্নাকাটি করতো। ওকে বোঝানো হয়েছিল আব্বার বাসা জেলখানা আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাবো। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো, তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাতেন এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন। মাকেই আব্বা বলে ডাকতো।

রাসেল কেমন ছিলেন? নানা স্মৃতি চারণে উঠে এসেছে।

৪ বছর বয়সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে শেখ রাসেলের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রথম দিকে পরিবারের কাউকে না কাউকে স্কুলে দিয়ে আসতে হতো। ধীরে ধীরে নিজেই স্কুলের ব্যাপারে আগ্রহী হয় শেখ রাসেল।

তখন স্কুলে যাওয়ার জন্য রাসেল ব্যাকুল হতো। স্কুলের মধ্যেই রাসেলের অনেক বন্ধু জুটে যায়। মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। সে বন্ধুবৎসল ছিল। ধীরে ধীরে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে ওঠে রাসেল। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে শেখ রাসেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়।

শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণে জানা যায়, শিক্ষিকাকে খুব সম্মান করতো শেখ রাসেল। খুব দুষ্টপ্রকৃতির ছিল তাই শিক্ষককে রাসেলের কথা শুনতে হতো। নইলে সে পড়াশোনায় মনোযোগী হতো না। তাই শিক্ষিকাও রাসেলের কথা অনুযায়ী শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষিকার খাবার-দাবারের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল শেখ রাসেল। প্রত্যেক দিন শিক্ষিকার জন্য দুটি করে মিষ্টি বরাদ্দ থাকতো এবং শিক্ষিকাকে খেতে হতো রাসেলের ইচ্ছানুযায়ী। এভাবেই চলছিল শেখ রাসেলের বাল্যকাল।

পরিবারের সবার আদর গায়ে মেখে চঞ্চল রাসেল মাতিয়ে রাখতো ৩২ নম্বর ধানমন্ডির পুরো বাড়ি। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সব সময় সভা-সমাবেশ লেগেই থাকতো। কত মানুষের আনাগোনা ছিল। তাদের স্নেহও পেতো ছোট্ট রাসেল।

মাত্র ১১ বছর বয়সেই তাঁর কাজকর্ম ও আচরণে নেতৃত্বের গুণাগুনের খোঁজ মিলে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক শিশুদের একত্রিত করতে পারতো শেখ রাসেল। এছাড়া স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বলে সে সময়ের তার বন্ধুর বয়ানে জানা যায়। একসঙ্গে পড়া তার এক বন্ধু সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, প্রায়ই শেখ রাসেল বন্ধুদের হাওয়াই মিঠাই কিনে খাওয়াতেন। নিজে খাওয়ার চেয়ে বন্ধুদের মধ্যে হাওয়াই মিঠাই বিলাতেই রাসেল বেশি পছন্দ করতেন। আর সেজন্য স্কুলের বাইরে থেকে হাওয়াই মিঠাই কিনে আনতেন। আর সেটা বিলানোর সময় প্রচুর হই-হুল্লোড় হতো। শেখ রাসেলের বন্ধু হাফিজুল হক রুবেল এক স্মৃতিকথায় বলেন, শেখ রাসেল ফুটবল খেলতে পছন্দ করতেন।

ক্লাসের ফাঁকে বা টিফিনে তারা ফুটবল খেলতেন। খেলার ক্ষেত্রে রাসেলের আগ্রহই ছিল বেশি। তিনি অন্যদের উৎসাহ দিতেন। আর ক্লাসে তার আচরণ ছিল শান্ত। পড়া ধরলে সবার আগে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেন তিনি। আর উত্তর জানা না থাকলে চুপ করে থাকতেন। রুবেল আরও বলেন, রাসেল পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। ভালো রেজাল্টও করতেন। তখন স্কুলের নিয়ম ছিল রেজাল্ট শিটে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে আবার স্কুলে জমা দিতে হতো। কিন্তু শেখ রাসেলের রেজাল্ট শিট জমা দিতে মাঝে মধ্যেই দেরি হতো। এজন্য সাধারণত তিন থেকে চার দিন সময় দেওয়া হতো। শিক্ষকেরা রেজাল্ট শিট জমা দিতে দেরির কারণ জানতে চাইলে রাসেল যথাযথ জবাব দিতেন। তার বাবা দেশে না থাকা বা রাষ্ট্রীয় কাজে ঢাকার বাইরে থাকার কারণেই এমন হতো বলে জানাতেন রাসেল। বন্ধুদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে শেখ রাসেল।

শিশু রাসলের মিনতি উপেক্ষা করে 'মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে রাসেলকে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা। শেখ রাসেলের ছোট্ট বুকটা তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে শিশু রাসেলের ভেতরে কেমন হয়েছিল তা আজ অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শেখ রাসেল এখন এক অবিস্মরণীয় ভালোবাসার নাম। যে নাম বাঙালি কখনো ভুলে না।

ঘাতকেরা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধুর কোনও ছেলে অথবা কনিষ্ঠ পুত্র বেঁচে থাকলে একদিন দেশের নেতৃত্বে আসবে। তাই আগেভাগেই তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতেন। বিশ্বের শোষিত মানুষের নেতা হতেন। অথবা বাবার দেওয়া নামের স্বাক্ষর রাখতেন পড়ালেখা ও গবেষণায়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও আমাদের জাতির পিতা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হওয়ার কারণে শরীরের প্রতিটি শিরায় বহমান ছিল সুন্দর আচরণ, মানবতা ও মমত্ববোধ। তাই শেখ রাসেলকে দেশের সব শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি করতে হবে। তাহলেই একটি মানবিক জাতি আমরা পেতে পারি। যাদের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে।♦

# আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব

## তোয়াব খান

১৫ই আগস্ট বাঙালির জীবনের ঘোর অমাবস্যার কলঙ্কময় দিন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারবর্গসহ নারী-শিশু নির্বিচারে নৃশংসভাবে হত্যা শুধু নয়, বাঙালি জাতিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। এদিন সকালের বেতার ঘোষণাসহ পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে ঘাতকচক্র বাঙালি তথা বাংলাদেশবিরোধী অভিসন্ধির ছাপ সুস্পষ্ট করে রেখেছে। ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা থেকে শুরু করে জয় বাংলার পরিবর্তে জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ বেতার হয়ে যায় পাকিস্তানি কায়দায় রেডিও বাংলাদেশ, উজির-নাজির, সদর ইরিয়াসত ইত্যাদি বচন আমদানি করতে গিয়ে হোঁচট খায় সম্ভবত বিপদাশঙ্কায়। পাকিস্তানি সন্দেহে জনগণ যদি মারমুখো হয়ে ওঠে। তাই কিছু সতর্কতা। সাঙ্গাতরা পিল পিল করে একে একে রেডিও স্টেশনে

হাজির হয়। দু-একজন লুঙ্গি পরেই চলে এসেছিল। যাদের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রপতিকে রক্ষার, লাইন দিয়ে খুনির পায়ে আনুগত্যের অঞ্জলি নিবেদন করে।

১৫ই আগস্ট সকালের চিত্রটি এমনিভাবেই গড়াতে থাকে। শুধু দুটি বাক্য মুখে মুখে ফিরছিল। একজন বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে বাড়ি থেকে পালাতে। অন্যজন বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর শুনে বলেছিলেন, 'সো হোয়াট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার।'

দিনের শেষে রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জীবনের অমাবস্যার কালও শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু খুনিরা কেন ৩২ নম্বরে গণহত্যার তারিখ ১৫ই আগস্ট নির্ধারণ করেছিল? আগস্টের এই সময়টা কী কারণে তাদের কাছে প্রকৃষ্ট বলে মনে হলো? ১৯৭৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মোড় নিতে যাচ্ছিল। প্রধান সমস্যা ছিল খাদ্য, সবজি, লবণ ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর উদ্দীপক অভিযানে মানুষ যেখানে যতটুকু জমি পেয়েছে সেখানেই ফসল ফলানোর চেষ্টা নিয়েছে। ফলে ধান, সবজি, মরিচ, লবণ ইত্যাদির বাম্পার ফলনের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক আমলের ঘুণে ধরা প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে বঙ্গবন্ধু নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। জেলায় জেলায় গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় প্রশাসনকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পথে। জেলায় জেলায় জাতীয় দলের সাংগঠনিক অবকাঠামো একটি সুস্পষ্ট রূপ নিতে যাচ্ছে।

খুনিদের মোড়লরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা কম্পিউটারের ছকে ফেলে অঙ্ক কষে সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, এটাই আঘাত হানার উপযুক্ত সময়। দেরি হয়ে গেলে ফসলের বাম্পার ফলন, নতুন জনভিত্তিক প্রশাসনিক অবকাঠামোর সুফল এবং সুসংগঠিত জাতীয় রাজনৈতিক দলের জোয়ার– সব ফসলই বাংলাদেশের জাতির জনক একসঙ্গে তুলতে পারবেন। তখন তাঁকে কোনোমতেই আর আটকানো যাবে না। পিএল ৪৮০-র খাদ্যশস্য দেওয়া বন্ধ হোক বা পাট বিক্রিতে রক্তচক্ষুর শাসানি, কোনো কিছু তিনি পরোয়া করবেন না।

**অতএব ১৫ই আগস্ট**

কিছু বাড়তি সুবিধাও তাদের কম্পিউটার ছকে ছিল। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আর ১৫ই আগস্ট ভারতের। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতারা ব্যস্ত থাকবেন উৎসবে বা ছুটি ভোগে।

তাই তাৎক্ষণিক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের আশঙ্কাও কিঞ্চিৎ কম। পাকিস্তানিরাও ছুটির পরে কোমর বাঁধার সময় পাবে।

কম্পিউটারে ছক কষে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাধর শক্তি আর তাদের অনুচর দেশটির এহেন হীন চক্রান্তে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা খুব ভালো করেই জানে মুজিব মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারলে বাংলাদেশের মূল ভিত্তিতে মোক্ষম আঘাত হানা যাবে। যে চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তাও ধসিয়ে দেওয়া যাবে। তাদের চক্রান্তের হাতিয়ার হিসেবে একে একে শামিল হয়েছে মীরজাফরের ভাবশিষ্য মুজিবনগর সরকারেরই মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, আমলা মাহবুব আলম চাষী, সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা, যার মুক্তিযোদ্ধা অভিধা নিয়ে সেদিন কেউ প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি বঙ্গবন্ধুর সরকারের মন্ত্রিপরিষদের বেশির ভাগ সদস্যকে মোশতাক-চাষী-ঠাকুর চক্র ছলেবলে কৌশলে মন্ত্রী বানিয়ে ফেলে। বিভ্রান্তির মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কম্পিউটারে ছক করা কুচক্রীরা নাকি তাদের মহাচক্রজালের প্রাথমিক পর্যায়ে কখনোই নিজস্ব খাস লোক সামনে আনে না। প্রাথমিক ঝড়ঝাপটার শেষে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে আসল ব্যক্তি স্বরূপে আবির্ভূত হন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর ৭ নভেম্বরের তথাকথিত সিপাহি-জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সামাল দিতে আবির্ভাব ঘটে 'সত্যিকারের নেতা'র। তিনি বনে যান ত্রাণকর্তা। জেনারেল জিয়া জেলে পাঠান ঘৃণিত খন্দকার মোশতাককে। আর তাঁর উদ্ধারকারী কর্নেল তাহেরকে অচ্ছুত বানিয়ে অচিরাৎ জেলে পোরা হয়। ১৫ই আগস্ট গণহত্যার পর শাপগ্রস্ত জাতির জীবনে শুরু হয় কালো অধ্যায়ের আরো এক পর্ব। জেলের মধ্যে রেখে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। জিয়া কোনো দিনই জেলহত্যার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেননি।

খন্দকার মোশতাকের হেডগিয়ার (টুপি) আর বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা পাকিস্তানীকরণের ধারাবাহিকতায় একের পর এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিতে থাকেন। কলমের এক খোঁচায় সংবিধানের মৌল চার নীতি সংশোধন হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থানে আসে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। জাতিসত্তার এমন অদ্ভুত অভিধার পরিণতি কী দাঁড়াতে পারে তা স্রষ্টারা দেখে যেতে পারেননি। অনেকেই ইন্তেকাল করেছেন। দুনিয়ার শোষিত মানুষের সংগ্রামে শরিক হওয়ার, ঘোষণাটি হয়ে গেল ইসলামী দুনিয়ার সংহতি। আর সমাজতন্ত্র সমূলে উপড়ে ফেলে বসল জনকল্যাণের কথা। ধর্মনিরপেক্ষতা ধারাটি বাতিল করে এলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। আর বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা

সংবিধানে স্বীকৃত এই শব্দগুলো টানা ২১ বছর সরকারের কোনো দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র বা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের জবানে একবারের জন্যও উচ্চারিত বা লেখা হয়নি।

কবি শামসুর রাহমানের ভাষায় 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর অবস্থার কিছু পরবর্তন ঘটে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট গণহত্যার পর দেশটা বস্তুতপক্ষে আধা ফ্যাসিস্ট কায়দায় শাসিত হচ্ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হঠাৎ করে নয়, ধাপে ধাপে ছাত্রনেতা থেকে যুবনেতা, যুবনেতা থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মঞ্চে প্রবেশ করেন।

১৫ই আগস্ট গণহত্যার জল্লাদরা, তাদের দোসর পাকিস্তান আর কম্পিউটারে ছক কষা তাদের মোড়লরা দুর্ভিক্ষ অবস্থায় খাদ্যের জাহাজ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েও যখন দুর্দমনীয় শেখ মুজিবকে ঘায়েল করতে পারল না, তখন গণহত্যার পথই তারা বেছে নেয়।

**এবার কিংবদন্তির কথা**

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কিংবদন্তির কথায় বলেছেন:

'আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি–/ তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল/তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।/তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন/অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন/পতিত জমি আবাদের কথা

বলতেন/তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।/জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা,/কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।'

এবার আমাদেরও কিংবদন্তির কথা বলতে হবে। কারণ মিথ্যার অরণ্য, শ্বাপদের মুখোশ খুলতে হবে।

আমাদের পিতৃপুরুষ পলিমাটির সৌরভে আচ্ছাদিত। তাঁর বুকেও রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।

তিনিও কবিতার ভাষায় কথা বলতেন। রেসকোর্স ময়দানে অজুত লক্ষ কোটি সন্তানকে ডাক দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম.... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো।'

পাকিস্তানের জবরদস্ত সামরিক শাসকদের নাকের ডগায় বাস করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সপক্ষে এর চেয়ে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার আশ্বাস আর কি হতে পারত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তো তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে কোনো সমরনায়ক বা সেনাপতির আহ্বানে শুরু হয়নি। তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা আর কে বলতে পারবে? তিনি তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন। বলেছেন : 'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।'

তিনি স্বপ্নের মতো সত্য ভাষণে কথা বলতেন। তিনি বলতেন : 'স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিতে হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে। শান্তিতে থাকবে।'

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি/আমি আমার পিতৃপুরুষের কথা বলছি।/তাঁর বুকে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল/আমি একগুচ্ছ রক্তজবার কথা বলছি।

তিনি (বঙ্গবন্ধু) ১০ জানুয়ারি স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনা সভায় আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আপনারা জানেন যে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান, আমি জানি মুসলমানমাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন পাকিস্তানি কারাগার থেকে স্বদেশভূমিতে।

তখন আমরা পর্বতের মতো অবিচল/এবং ধ্রুবনক্ষত্রের মতো স্থির লক্ষ্য হলাম।/আমি কিংবদন্তির কথা বলছি/আমি আমার পিতৃপুরুষের কথা বলছি।/আমি স্থির লক্ষ্য মানুষের/সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা বলছি/শ্রেণিযুদ্ধের অলিন্দে/ইতিহাসের বিচরণের কথা বলছি/আমি ইতিহাস এবং স্বপ্নের কথা বলছি।/স্বপ্নের মতো সত্য ভাষণ ইতিহাস।

আমি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের কথা বলছি।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কী ঘটেছে তার কথা একবার স্মরণ করলেই এ ঘটনার বিশাল তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর যে সংলাপ হয়েছিল তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আলোকসঞ্চারী। একটু উদ্ধৃতি :

'বঙ্গবন্ধু : মাদাম, আপনি কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন?

ইন্দিরা গান্ধী : বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তো এখন পর্যন্ত নাজুক আছে। পুরো সিচুয়েশন বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেটাই করা হবে।

বঙ্গবন্ধু : মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ৩০ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি লাখ দশেকের মৃত্যু হয় আমি অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা গান্ধী : এক্সিলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী ১৭ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

বঙ্গবন্ধু : মাদাম, কেন বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন?

ইন্দিরা গান্ধী : এক্সিলেন্সি, প্রাইম মিনিস্টার ১৭ মার্চ আপনার জন্মদিন।'

(উদ্ধৃতি : বঙ্গবন্ধু, কবীর চৌধুরী)

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বড় সাফল্য স্বাধীনতার ৯ মাসের মধ্যে দেশকে একটি চমৎকার সংবিধান উপহার দেওয়া।

'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব
আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব।'♦

*লেখক : বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব ছিলেন*
*সৌজন্যে : কালের কণ্ঠ*

# একটি পর্যালোচনা
# মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানের সমসাময়িক অবস্থান

**বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক**

গত ১৬ সেপ্টেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে 'ঢাকায় পাকিস্তানি অপতৎপরতা' শিরোনামে যে সংবাদটি ছাপা হয়েছে, তা পড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল মানুষই আতঙ্কিত হতে বাধ্য। দীর্ঘ সে বিশেষ প্রতিবেদনটির প্রতিপাদ্য হলো– কয়েক বছর চুপ থাকার পর পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই আবারও কোমরে কাছা বেঁধে নেমেছে বাংলাদেশকে অচল করে দিতে। লেখা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তান হাইকমিশন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমে কর্মরতদের নিয়ে একটি হোয়াটসআপ

গ্রুপ খুলে ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা রকমের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। পাশাপাশি স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে ভুল তথ্যের পাশাপাশি বানোয়াট তথ্য প্রচার করছে।

উল্লেখ্য যে অতীতেও ঢাকাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মকর্তারা বাংলাদেশে জঙ্গি অর্থায়নের সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ২০০০ সালে পাকিস্তানি উপ-রাষ্ট্রদূত এরফান রেজা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশ্যে আপত্তিকর ভাষণ দেওয়ায় তাকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, যেটি ছিল বাংলাদেশ থেকে কোন কূটনীতিককে বহিষ্কারের একমাত্র ঘটনা।

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার অপতৎপরতা নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনটির দাবি যে কত নির্ভুল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে অবাধে চালিয়ে যাওয়া কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে, যেগুলোর বেশ কয়েকটি চালাচ্ছে পাকিস্তানিরা আর বাকি কয়েকটি বাঙালি নামক পাকিস্তানপ্রেমিরা। উভয়ের উদ্দেশ্যই এক, বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের সরকারকে অসাংবিধানিকভাবে উৎখাত করে, দেশটিকে পুনরায় পাকিস্তানে পরিণত করা। আর যতই নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে নিশ্চিতভাবে পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর অর্থায়নে এদের তৎপরতাও বেড়ে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি পরের নির্বাচনের দিকে, যাতে আওয়ামী লীগ সরকারকে দূর করা যায়।

এরই মধ্যে পাকিস্তান আবার শুরু করেছে নতুন চাল, তারই অংশ হিসেবে তারা সম্প্রতি মারিয়া জাদুন নামক এক পাকিস্তানি নারীকে দিয়ে মিথ্যাচারে ভরপুর এক ভিডিও তৈরি করে তা নেট দুনিয়ায় ছেড়েছে। ভিডিওতে ওই নারী বিএনপি-জামাত নেতাদের সুরেই বললো, 'বঙ্গবন্ধু তার ৭ মার্চ ভাষণের শেষে জয় বাংলা বলার পর জয় পাকিস্তানও বলেছেন'। ওই নারী শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, সে 'জয় পাকিস্তান' শব্দটি তার ভিডিওতে জোড়া লাগিয়েছে। এটি যে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর নয়, বরং অন্যের কণ্ঠ কৃত্রিমভাবে জোড়া দেয়া হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়, যা কোন শ্রোতারই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। মারিয়া জাদুনের নগ্ন, নির্লজ্জ মিথ্যাচার সেখানেই শেষ হয়নি, সে এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) এ কে খন্দকারের লেখা বইয়ের উদ্ধৃতিও দিয়েছে। অথচ তার লেখা যে অসত্য ছিল পরবর্তীতে এ কে খন্দকার সে কথা নিজেই প্রকাশ্যে স্বীকার করে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর লেখার জন্য জনগণের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। বয়সের চাপে স্মৃতি লোপ পাওয়া এ কে খন্দকার যে কিছু কুচক্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওই অসত্য কথাগুলো লিখেছেন, তাও তার পরবর্তী স্বীকারোক্তি থেকে পরিষ্কার হয়েছে। মারিয়া জাদুন তার মিথ্যাচারের পরিধি বাড়িয়ে এও বলেছে যে, 'বঙ্গবন্ধু নাকি পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এটা জেনে রাগান্বিত হয়েছিলেন যে

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি নাকি তখন বলেছিলেন, তিনি তো স্বাধীনতা চাননি, তিনি সংযুক্ত পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তিনি নাকি তখনি পাকিস্তান রেডিওর মাধ্যমে সেকথা প্রচার করতে চেয়েছিলেন।' তার এ উলঙ্গ মিথ্যাচারও স্ব-প্রমাণিত। এটা যদি সত্যি হতো তাহলে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি লন্ডন পৌঁছেই সেকথা বলতেন, অথচ লন্ডন পৌঁছে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শুধু উল্লাসই প্রকাশ করেননি, বরং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ যে জেলখানার অভ্যন্তরে তার কবরও খুঁড়ে ছিল একথাও ব্যক্ত করেছিলেন।

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, তিনি পাকিস্তানিদের বলেছিলেন তাকে ফাঁসি দেওয়া হলে তার মরদেহ যেন বাংলাদেশে পাঠানো হয়। মারিয়া জাদুনের কথা যে মিথ্যার বেসাতি দ্বারা তৈরি তার আরো প্রমাণ হলো ১৯৭১-এর অগাস্ট মাসেই বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য বিচার করার ইয়াহিয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা, যা বিশ্বময় গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যদি সংযুক্ত পাকিস্তান চাইতেন, তাহলে ইয়াহিয়া এ ধরনের ঘোষণা দিতো না, বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রশ্ন উঠতো না। লন্ডনে বঙ্গবন্ধু কান্নাজড়িত কণ্ঠে এও বলেছিলেন যে. পাকিস্তানিরা বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, যে কথা অন্য বহু জনের মতো আমিও নিজ কানে শুনেছি সেদিন ক্লারিজেস হোটেলে উপস্থিত থেকে, যে কথা গণমাধ্যমের সহায়তায় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ শুনেছে। বঙ্গবন্ধু যদি পাকিস্তান ভাঙ্গার বিরুদ্ধে থাকতেন তাহলে কেন তাকে ৯ মাস পাকিস্তানি কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল? বঙ্গবন্ধু ঢাকা পৌঁছেই একদিকে পাকিস্তনিদের দ্বারা সংঘটিত গণধর্ষণের ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে আবেগজড়িত কণ্ঠে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে আমাদের বিজয়ের জন্য উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। ঢাকার পথে দিল্লিতে যাত্রা বিরতির সময়ে দিল্লির বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে তিনি বাংলাদেশের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতের জনগণ, সেনাবাহিনী এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে কোলকাতায় স্মরণকালের সর্ববৃহৎ সভায় ভাষণ দিয়েও তিনি একই কথা বলেছিলেন। দেশে ফিরেই তিনি পাকিস্তানি ক্রীড়ানকদের সাজা দেওয়ার জন্য দালাল আইন প্রণয়ন করে ৩০ হাজার বেশি পাকিস্তানি চরকে আটক করেছিলেন, তিনি বাংলাদেশে ফিরেই যে সংবিধান প্রণয়নে হাত দিয়েছিলেন তার অন্যতম বিধান ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করা। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের চরদের দ্বারা ঘটিত যুদ্ধাপরাধের অপরাধে যুদ্ধাপরাধিদের সাজা দেওয়ার জন্য সে বছরই যুদ্ধাপরাধ বিচারের আইন পাশ করেন। বঙ্গবন্ধু তখনই পাকিস্তানের কাছে দাবি

করেছিলেন আমাদের পাওনা টাকা, সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার, যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সৈন্যদের বিচার করার। এটিও প্রমাণিত সত্য যে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে বহন করা বিমানে দবির সিদ্দিকী নামে এক রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুসলিম লীগার বাঙালিকে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য। বঙ্গবন্ধু যদি সত্যিই সংযুক্ত পাকিস্তান চাইতেন তা হলে ভুট্টো কেন সেই দবির সিদ্দিকিকে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য? সেই দবির সিদ্দিকিকে পরবর্তীতে কোলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা পরিকল্পনার কথা ফাঁস হলে। ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যায় পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল অতি প্রচ্ছন্ন।

সম্প্রতিকালে ৭০ দশকের মার্কিন গোপন দলিল অবমুক্ত হলে জানা যায় ভুট্টো ১৯৭৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে বলেছিল খুব শিগগির বঙ্গবন্ধুকে অপসারণ করা হবে, বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারি হবে আর সে সরকার হবে ভারতবিরোধী। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে ভুট্টো পাকিস্তানের সামরিক একাডেমিতে বলেছিল খুব শিগগির উপমহাদেশে বড় পরিবর্তন হবে। ১৯৭৪-এর জুন মাসে ভুট্টো যে আসলে আইএসআইয়ের চৌকস কর্মকর্তাদের নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার নীল নকশা তৈরিতে, তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ভুট্টোর সফরসঙ্গী সাংবাদিকরা পাকিস্তানে ফিরে গিয়েই লিখেছিল বাংলাদেশে শিগগিরই সামরিক অভ্যুত্থান হবে।

এসব ঘটনা প্রমাণ করছে, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই সে-ই নারী জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, যার জন্য তাকে বাংলাদেশে এনে বিচার করা দরকার। ওই নারীর ভিডিওটি অবিলম্বে বন্ধ করা এবং পাকিস্তানের কাছে এর জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া প্রয়োজন। মারিয়া জাদুন ছাড়াও পাকিস্তান থেকে একটি ইউটিউব পরিচালনা করছে জোনায়েদ ইসলাম নামক এক পাকিস্তানি। তার প্রচারেও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মিথ্যাচার এবং ভারত বিরোধিতা। তারা ধর্মকে ব্যবহার করছে তাদের অস্ত্র হিসেবে।

সেকালের অতি জনপ্রিয় ছায়াছবি 'হারানো সুরে' উত্তম কুমার সুচিত্রা সেনকে বলেছিলেন, 'কৌতুহল থাকা ভালো, কিন্তু তার সীমারেখা থাকা উচিত।' সুচিত্রা কিন্তু কৌতুহলের সীমা অতিক্রম করেছিলেন যুক্তিসঙ্গত কারণে, অর্থাৎ কারণ ছাড়া অতি কৌতুহলী কেউ হয় না।

আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে যে দেশটি আমাদের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক কৌতুহলের সীমারেখা লংঘন করছে তার নাম পাকিস্তান। আমাদের ব্যাপারে পাকিস্তান কেন এতো কৌতুহলী জানতে

চাইলে অধ্যাপক মুনতাসির মামুন বললেন, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করা খুব কঠিন বৈকি? ইতিহাস বলছে, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা জয়পাল ছেলে আনন্দ পালের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মিসরের রাণী ক্লিউপেট্রাও তার নিজের পোষা সাপের কামড় খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি ৯৩ হাজার সৈন্যের পরাজয় তো অতীতের যে কোন পরাজয়ের চেয়ে বেশি গ্লানিকর। এমনকি আত্মসমর্পণের দুইদিন আগেও বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান জেনারেল নিয়াজি প্রকাশ্যে উন্মাদের মতো হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। পাকিস্তান একাত্তর থেকেই তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যে বদ্ধপরিকর, তার প্রমাণিত তথ্যের ঘাটতি নেই, আর তাদের প্রতিশোধের টার্গেট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল আওয়ামী লীগ, কেননা এই দলের নেতাই পাকিস্তানকে বাধ্য করেছিলেন হাঁটুতে দাঁড়াতে। পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে না পেরে আজও লেগে আছে বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানে পরিণত করে একাত্তর সালে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে, আর এজন্য বাংলাদেশে তাদের প্রেমিক দল বিএনপি ও জামায়াত তো, গ্রাম্য বাংলায় প্রচলিত কথা অনুসারে 'এক পায়ে খাড়া'। এছাড়াও রয়েছে বহু পাকি- প্রেমীজন যারা পাকিস্তান ভেঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের সৃষ্টি কখনো মেনে নিতে পারে নি। এর মধ্যে এক বিহারি পিতার পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাকসুর এক সাবেক ভিপি, কুখ্যাত রাজাকার সবুর খানের ক্যামেরাম্যান ভাগিনা, আরো বহুজন। এদের সবার সঙ্গেই যে ঢাকাস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের যোগাযোগ রয়েছে, তার প্রমাণের অভাব নেই।

এছাড়াও আছে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েক জন সাংবাদিক ও সেনা কর্মকর্তা যারা দেশে বিভিন্ন অপরাধের আসামী। আরো রয়েছে পাকিস্তানি অর্থপ্রাপ্ত চরেরা। পাকিস্তানের সে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশটি অতীতে ভূমিকা নিয়েছিল বিএনপি, জামায়াতকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে ক্ষমতায় আনার। ২০০০ সালে পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী যে বিএনপি-জামায়াতকে প্রচুর পয়সা দিয়েছিল তাদের নির্বাচনে জয়ের জন্য, তা পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা প্রধান এক জেনারেল পাকিস্তানের আদালতে প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন। এরপর পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ঢাকাস্থ পাকিস্তানি দূতাবাস শুরু করে বাংলাদেশে কর্মরত জঙ্গিদের অর্থায়ন। হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল দুই জন পাকিস্তানি কূটনীতিক, ফারিন আরশাদ এবং মাজহার খান। ২০১৫ সালে তাদের দুজনকেই বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আরো পূর্বে পাকিস্তানি উপরাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভাষণের জন্য।

২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করে জাতির পিতার রক্তের ধারকদের শেষ করতে যে পাকিস্তান ২১ অগাস্ট গ্রেনেড আক্রমণে কুশিলবের ভূমিকায় ছিল, তার প্রমাণ অ-বিস্ফোরিত গ্রেনেডে পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির ছাপ এবং মাজেদ ভাট ও আব্দুল মালেক নামীয় দুজন পাকিস্তানির জড়িত থাকা, যাদের দুজনকেই বিচারিক আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ২০১৩ সালে উত্তরা থেকে র‍্যাব যে কজন ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল এক পাকিস্তানি, যে আইএসআই-এর চর হলেও পিআইএ-র ট্রাফিক অফিসারের ছদ্মবেশে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল।

এসব অপচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তান এক নতুন কৌশল নিল, যা ছিল ছলে, কৌশলে চীনের সহায়তায় বাংলাদেশের বন্ধু সাজার। পাকিস্তান জানে বাংলার মানুষ পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব মেনে নেবে না যতদিন পাকিস্তান একাত্তরের গণহত্যা, গণধর্ষণের জন্য ক্ষমা না চাইবে, আমাদের পাওনা টাকা ও সম্পদ ফেরত না দিবে, যুদ্ধাপরাধে দায়ী পাকিস্তানি সৈন্যদের বিচার না করবে। কিন্তু পাকিস্তান সে দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক ফন্দি বের করলো এই বলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান চুক্তিতেই এসব বিষয় সমাধান হয়ে গেছে, যেটি সর্বৈব মিথ্যাচার। বাংলাদেশ কখনো এ ধরনের কথা দেয়নি, আর তা ছাড়া সেই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত না হওয়ায়, তা কখনো আইনি মর্যাদা পায়নি। একইসঙ্গে পাকিস্তান ড. আমেনা মাহমুদ, সাদাফ ফারুক এবং নাদিয়া আওয়ান নামের তিনজনকে 'বুদ্ধিজীবী' সাজিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় যে সব মিথ্যা কথা লেখালো, সংক্ষেপে তা হলো এই যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ধর্ম এক হওয়ায় তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। লেখকত্রয় বড় বড় ডিগ্রির ধারক হলেও তারা মনে করতে পারলেন না যে বাঙালিদের ভাষা-কৃষ্টি-ঐতিহ্য পাকিস্তানিদের থেকে বহু গুণে আলাদা এবং সেই পার্থক্যের কারণেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ ভেবেছিল, পাকিস্তানিরা আর আমরা এক নই, তাই এটি এক দেশ হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু সরাসরি বলতেন, "মাউড়াদের" সাথে আমরা এক থাকতে পারি না। বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৫৫ সালেই পাকিস্তান পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দাবি করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব বাংলা' রাখা হোক। এমনকি পাকিস্তানের এবং বঙ্গীয় অঞ্চলের ইতিহাসেও রয়েছে বেজায় তফাৎ। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে পাকিস্তানিরা ইরান, তুরস্কের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ, আর আমরা মাছ খাওয়া খাঁটি বাঙালি, যে কথা আইয়ুব খানও তার 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস' পুস্তকে লিখেছিলেন। সেই তিন লেখক বাংলার মুক্তিযুদ্ধের

চেতনায় মানুষের মনে শুধু বিরূপ প্রতিক্রিয়াই জন্ম দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের মনে জন্মেছে ঘৃণা।

গত ২৬ মার্চ সবাই ভেবেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন। ক্ষমাতো তিনি চানই নি, বরং বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের 'সাবেক রাষ্ট্রপতি' হিসেবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই 'বঙ্গবন্ধু' নামে পরিচিত, যেমন পরিচিত 'কামাল আতাতুর্ক', 'মহাত্মা গান্ধী'। ইমরান খান বঙ্গবন্ধু শব্দটিতো উচ্চারণ করেনই নি, এমন কি বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবেও উল্লেখ করেননি, যা প্রমাণ করছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের অনীহা এখনও বিরাজমান, কারণ তিনিই পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সৃষ্টি করেন।

১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্টের প্রাক্কালে পাকিস্তান যে ধরনের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক প্রচারণা করতো, আজও তারা তেমন প্রচারণায় নেমেছে। তাদের সে প্রচারণা বন্ধ করা এবং পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠতা বর্জন না করলে সমূহ বিপদ হতে পারে, যা কিনা পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং এ ব্যাপারে চীনেরও হাত রয়েছে, রয়েছে পাকিস্তানপ্রেমি বহু বাঙালির।

এটা মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানে কখনো শাসক পরিবর্তন হয় না, শুধু ব্যক্তি পরিবর্তন হয়, কেননা, সে দেশের শাসক হচ্ছে তাদের সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা, আইএসআই, যারা তাদের ইচ্ছা মাফিক এক ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে চেয়ারে বসায় মাত্র।

এটি আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে আফগানিস্তানের তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। তালেবানিদের থাবা যেন বাংলাদেশে প্রসারিত হতে না পারে এবং বাংলাদেশের ধর্মান্ধরা যাতে পাকিস্তান বা আফগানিস্তান গিয়ে তালেবানি প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র নিয়ে দেশে ফেরত এসে জঙ্গিবাদ ও উগ্র কর্মকাণ্ড শুরু করতে না পারে, সে জন্য পাকিস্তানের ব্যাপারে আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে।♦

*লেখক : আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।*

ক | বি | তা |

# তোমারই উদ্দেশ্যে

## খালেক বিন জয়েনউদদীন

তোমার দয়া ও করুণায় হঠাৎ থেমে যায়
অবেলার ঝড়-বাদল, বিনাশী বিদ্যুৎ ফণা
দিগন্তে ওড়ে শান্তির একঝাঁক প্রজাপতি–
তপ্ত মাটি ও মানুষ ফিরে পায় হারানো দিশা।

তোমার ছোঁয়া ও আশীষে শূন্য খেতের ফসল
গোলা ভরায়, মিথ্যের জাল ফেলে পালায় শত্রু
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়ায় তোমার মায়াবী সুবাস
পদ্মপুকুরে ফোঁটে রক্তরাঙা শক্ত কলি।

আমাদের স্বপ্ন ও প্রতীক্ষার শেষ নেই তোমার দানে
ঘুমভাঙা শিশুর মতো তোমাকে স্মরি, তোমারই উদ্দেশ্যে।

# বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা)

**সোহরাব পাশা**

আল-আমিন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)
বিশ্ব ভুবনের আলোকিত অনন্ত শান্তির ঝর্নাধারা
এনেছেন তিনি জ্যোতির্ময় অমিয় দ্বীন– 'ইসলাম'
সত্য-ন্যায়ের দশদিগন্তে বেভুল পথভ্রষ্ট যারা,
খুঁজে পেয়ে তারা দিদারের পথ-আনন্দে আত্মহারা;

অনাহারে-অর্ধাহারে বুকে আগুন পাথর বেঁধে
বিধর্মীরা রক্তাক্ত করেছে তাঁর পবিত্র শরীর
বিনিদ্র কেটেছে রাত্রি- মানুষের কল্যাণে কেঁদে,
নিজের সুখ-শান্তির জন্যে কখনো হননি অধীর;

তুমি তো নূরনবী সর্বকালের আলোর দিশারি
ভুল পথে হেঁটে বেড়েছে যাদের পাপের ঋণ
দেখাও তুমি পথের দিশা-হে কাণ্ডারি
ক্ষমা করো তাদের-অন্তরে দাও পবিত্র দ্বীন;

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা) বিশ্বের মহাজ্ঞানী
তাঁর দেখানো পথে হিংসা-বিদ্বেষের করি কুরবানি।

# খোদার হাবীব বিশ্বনবী

## আ শ ম বাবর আলী

সত্যদ্বীনের বার্তা নিয়ে তার প্রচারের কাজে,
খোদার হাবীব বিশ্বনবী এলেন বিশ্বমাঝে।
অতীত দিনের মিথ্যা ভেঙে প্রচার করতে দ্বীন,
মোর নবীরে পাঠিয়ে দিলেন রাব্বুল আ'লামীন।

বিশ্বাসীদের সুসংবাদদাতা অন্যের সাবধানকারী,
সত্যপথ্যে বাইতে তরী তিনি যে কাণ্ডারি।
গোটা মানব জাতির জন্য এলেন ধরার বুকে,
বাণী যে তাঁর করবে গ্রহণ থাকবে তো সেই সুখে।

সেই সুখ তো শুধুমাত্র পরজনমের নয়,
এই জগতেও সবখানেতে শুভ কল্যাণময়।
বিশেষ কোনো জাতির কিংবা গোষ্ঠীর না হয়ে,
সব মানুষের জন্য এলেন সৎ পয়গাম লয়ে।

সৃষ্টিকুলের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ রহমত,
সত্য-শান্তির পথ দিশারী নূরনবী হযরত।
সকল সৃষ্টির প্রশংসিত মুহাম্মদ তাঁর নাম,
তাঁর ওপরে দরূদ সবার– 'সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম।'

# মোহাম্মাদ রাসূল (সা)

## আবুল হোসেন আজাদ

আকাশ মাটি চন্দ্র সূর্য বাতাস গ্রহ তারা
চারিদিকে আজকে শুধু খুশির ঝর্ণা ধারা।
এত হাসি এত খুশি জান কি তা কেউ
কেন এমন উছলে পড়া হৃদয় গাঙে ঢেউ।

মা আমিনার কোলে এলেন ফুটফুটে এক চাঁদ
তাঁকেই পেয়ে মরুর বুকে ভাঙল খুশির বাঁধ।
মরুদ্যানে সুরভিত সে যে গোলাপ ফুল
তিনি হলেন বিশ্ব নবী মোহাম্মাদ রাসূল (সা)।

তাঁর শানে সব পড়ে দরুদ জ্বিন ও ফেরেশতারা
তাঁর নামেতে মাতোয়ারা সৃষ্টি পাগলপারা।
উষর মরুর খেজুর বীথি ফুল পাখিদের গান
জানায় সালাম তাঁকে সবাই আকুল হয়ে প্রাণ।

রাসূল এলেন তাইতো গেল পাপের অন্ধকার
নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হলো চারিধার।
ভালবেসে বুকের ভিতর রাসূল কে তাই রাখি
তাঁর নামেতে জুড়ায় হৃদয় হয় যে শীতল আঁখি।

# নূরের কিস্তিতে

## মোহাম্মদ ইলইয়াছ

মহাশূন্যে ছিলো কালো মেঘের সেকি গর্জন
মরুর বুকে নেমেছিলো ঘন ভয়াল অন্ধকার
পবিত্র ঘরে ভূত-প্রেতের জন্য মিথ্যার প্রণতি
তুমি এলে নূরের কিস্তিতে আঁধার তাড়াতে।

চতুর্দিকে হানাহানি, বিভেদ নর-নারীতে প্রায়শ
অমঙ্গলের ধুলোয় ধূসরিত খর্জ্জুর বাগান
অশান্তির বেড়াজালে বন্দি এই মানবকূল
তুমি এলে ঐশী সন্দেশের শুভ বার্তা নিয়ে।

ভয়াল প্রেতগুলো পালালো গিরিগুহায়
আকাশের কালো মেঘগুলো মিলিয়ে গেলো
নব বসন্ত দেখা দিলো নিখিল গগনের মর্ত্যে
তুমি বললে তিনিই এক এবং তাঁর নির্দেশেই ধরাধাম।

তোমার করুণায় আমাদের ঘর-গেরস্থালি
নিত্যদিনের সকাল-সন্ধ্যার সকল আয়োজন।

# শির করে দাও নত

## মিলন সব্যসাচী

অনুতাপে একলা জেগে নীরব নিঝুম রাতে
কখনও তো চাইনি ক্ষমা করুণ মোনাজাতে
পথের মাঝে লোলুক কাঁটা পদতলে ফুটে
একজনমের মিথ্যে মোহ হঠাৎ গেছে টুটে।

হিরক ভেবে কাচের কণা আঁকড়ে ছিলাম আমি
পাপের আগুন পুণ্য পোড়ায় জানে অন্তর্যামী
ভুলে ভরা ভুবন আমার উদাস-উপহাসে
কী হারানোর বেদনায় আজ অশ্রুবানে ভাসে?

প্রাণহীন পাথরের মতো মুখে নাই তো ভাষা
অবেলা আজ কে মিটাবে ধূসর মরুর আশা
দিকভ্রান্ত এক পথিক আমি এই পৃথিবীর পরে
সত্যের সন্ধান পেতে আমার অন্তর কেঁদে মরে।

কেমন করে কোন পথে যাই ভাবছি একা শুধু
দৃষ্টির সীমায় হাতছানি দেয় তপ্ত-মরুর ধূ ধূ
কোথায়ও নাই অধমের ঠাঁই অসীম আকাশ- তলে
জল-তরঙ্গে ভাসবো কী হায় ব্যথার নোনাজলে?

জীবন নদীর তীরে ডাকে শেষের খেয়াখানি
আমার শুধু চাওয়া খোদা তোমার মেহেরবাণী
নবী আমার অন্তিম বিশ্বাস শেষ নিঃশ্বাসের মত
মসজিদেরই জায়নামাযে শির করে দাও নত।

দিল- কাবাতে সেজদায় নত আকুল অন্ধকারে
ভেতরমুখি আলোর পরশ পাই না বন্ধদ্বারে
মরু তৃষায় কাতর তবু বিদায় বেলায় তাড়া
খোদার দোস্ত নূর-নবীজী দাও গো আমার সাড়া।

# প্রতিমুহূর্ত বেদনা আর কষ্ট

## বাবুল তালুকদার

বুকের ওপর দিয়ে ইস্টিম রোলার চলে
তবু সহ্য করে যায় মানুষ প্রতিনিয়ত।
কষ্ট আর বেদনার পাহাড় গড়ে বুকে
চাপা পরে যায় আশা ভালোবাসা
ভেঙ্গে খানখান হয়।
অন্ধকারে তলিয়ে যায় মানব হৃদয়
বাঘের থাবা আর সিংহের গর্জনে
ভীত কেঁপে ওঠে ...
মাথা উঁচু করে আর দাঁড়াতে পারে না
পৃথিবীর আদ্যপ্রান্তে মানুষ।

# বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলে করীম (সা)

**আবদুস সালাম খান পাঠান**

সোনালী আলোর বন্যায় অপসৃত সেই অমাবস্যার–
রজনীর ঘোর অন্ধকার।
বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে যাঁর আগমন তিনি মহামানব
মহানবী (সা) রাহমাতুল্লিল আলামীন।
ইনসাফ, শান্তি সহিষ্ণুতার সুস্থ-সুন্দর সাম্যের সমাজ
জীবনের প্রতিষ্ঠাতা রাসূলে করীম (সা)।
তিনিতো 'উসওয়াতুন হাসানাহ'।

নবুওয়াতী জিন্দেগী আলোকে, ধর্মহীনতা, কুফর, কুসংস্কার
অশ্লীলতা দূরীভূত তাঁরই মহান আদর্শের সোনালী আভায়।
মহান আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাসের প্রচারে,
অন্ধ-বিশ্বাসের যুগে মক্কা মরুভূমে শান্তি ফিরে আসে।
ন্যায় বিচারে মদিনা সনদের আলোকে সমাজ গড়ায়।

কুল-কায়েনাতের সর্বত্র প্রিয় নবীজি (সা)
দয়া ও করুণায় ধন্য সবে,
ধন্য মানবজাতি ও সভ্যতা কুলমান।
অবিশ্বাসীদের পরিণাম চিরকাল দৃশ্যমান
খরা ও দুর্যোগে জগৎবাসীর অনাচারে,
জিঘাংসায় রূঢ় বাস্তবতা প্রতীয়মান।

তওবার দরজা, নাজাতের পথ খোলা সংযমে
কেবলি সত্য আরাধনায়।
নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জের পুণ্যালোকে
অপূর্ব মহিমায়।

# একটা যাদুঘরের স্বপ্ন

## মনি হায়দার

এতো ছোট বাড়ি?

চোখ মুখ কুঁচকে প্রশ্ন করে অভি। চোখের দৃষ্টি দাদার উপর থেকে আবার রাখে বাড়িটার উপর। অভির চোখে পাওয়ারের ভারী চশমা। পরনে হালকা আকাশ রঙের হাফ শার্ট। আর হাফ প্যান্ট। গলার নিচে টাই রক্ত রঙ টাই। পায়ে মোজাসহ সাদা জুতো। মাথা ভরা কালো চুল। মনে হচ্ছে দূরের দেশের একপুত্তুর অভি।

না, অভি দাদুর সঙ্গে এই বাড়ির সামনে একা আসেনি। সঙ্গে এসেছে চাচাতো ভাই সিন্দুক, চাচাতো কোন অমরাবতি। আরও আছে মামাতো বোন দোলনা। এই চারজনের সঙ্গে দাদাসাহেব- আবিদুর রহমান। আবিদুর রহমানের বয়স আশি বছর পার হয়ে একাশিতে পরেছে। কিন্তু দাদাসাহেবের শরীর দেখে মনে হয় না, এত্তো বয়স হয়েছে! ছিপছিপে গড়নের মানুষটির মধ্যে বাস করে ঘোড়দৌড়ের এক খেলার মাঠ। সেই মাঠে নাতী নাতনীদের নিয়ে সারাদিন মশগুল থাকেন দাদা সাহেব।

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ। সবার অবসর। হাই তুলে, গাল ফুলিয়ে, নাকে তেল দিয়ে সময় কাটে। দাদা সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন, আগামীকাল বিকেলে তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

কোথায় নিয়ে যাবে? অমরাবতি এক মুহূর্ত কথা ছাড়া থাকতে পারে না।

আগে থেকে বলবো না। আমার সঙ্গে গেলেই দেখতে পাবে। চলো–

ঠিক আছে। সিদ্ধান্ত জানায় চাচাতো ভাই সিন্দুক, ওরা কেউ যাক আর না যাক, আমি যাবো।

কিন্তু আবার অমরাবতি মুখ খোলে, দাদা সাহেব– যাবে কবে?

বললামতো আগামীকাল বিকেলের দিকে।

অপেক্ষায় থাকে সিন্দুক, অভি, অমরাবতি, দোলনা। পরের দিন বিকেলের দিকে গাড়িতে ওঠেন আবিদুর রহমান। সঙ্গে অভি, দোলনা, সিন্দুক আর অমরাবতি। মিরপুরের গোল চক্কর পার হয়ে গাড়ি আসে রোকেয়া স্বরণীতে। রোকেয়া স্বরণী পার হয়ে গাড়ি ঢোকে শের-ই-বাংলা নগরে। শের ই বাংলা নগর পার হয়ে গাড়ি ঢোকে মিরপুরের রাস্তায়। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পাশ ঘেঁষে গাড়ি আসাদ গেট পার হয়ে, শেখ কামাল রোড় পার হয়ে গাড়ি এসে থামে ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে।

নামো সবাই, দাদা সাহেব বলেন।

ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিলে চারজনে ঝটপট নামে। নেমেই দেখে দাদা সাহেব আবিদুর রহমান সামনের বাড়িটার দিকে ব্যথাভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে তিনি ইতিহাসের অমলিন পাতা একের পর এক উল্টাতে থাকেন। পিছনে দাঁড়িয়ে চার নাতীনাতনী।

দাদাভাই? তুমি কি ভাবছো? জানতে চায় সিন্দুক।

ভাবছি না দেখছি–

দোলনা হাত ধরে, কি দেখছো?

দেখছি ইতিহাস।

ইতিহাস কি দেখা যায়? অবাক সিন্দুক। সিন্দুক নবম শ্রেণীর ছাত্র। খুব মেধাবী।

হ্যাঁ দাদা ভাই, কিছু কিছু ইতিহাস দেখা যায়। আমার দেখা ইতিহাস তোমাদের দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছি। চলো, ভেতরে চলো। এই যে বাড়িটা ইতিহাস বাড়ি। বাড়িটা চেনোতো?

চিনবো না কেনো? চোখের ভারী পাওয়ারের চশমা ঠিক করতে করতে জবাব দেয় অভি, এটা শেখ মুজিবের বাড়ি।

হাসেন আবিদুর রহমান, ঠিক বলেছো।

বাড়ির দিকে পা বাড়ায় দাদাসাহেব। পেছন থেকে হাত ধরে অভি, শেখ মুজিবতো রাজা ছিলেন। সেই রাজার বাড়ি কি এতো ছোট কেনো?

হাসেন আবিদুর রহমান, রাখাল রাজাদের বাড়ি ছোট হয়। রাখাল রাজার বাড়ি যদি বিরাট হয়, বড় বড় লোহার গেট থাকে- সেই বাড়িতে কি রাখাল রাজার রাখাল বন্ধুরা ঢুকতে পারে? যাতে রাজার বাড়িতে সবাই ঢুকতে পারে, সেই জন্য আমাদের রাজা ছোট বাড়িতে থাকতেন। ভেতরে চলো, আরও ভালো করে দেখো।

সিন্দুক, অভি, দোলনা আর অমরাবতি ঢোকে রাজার বাড়ি ঢোকে দাদা সাহেবের হাত ধরে। একটা নিটোল বাড়ি। বাড়ির মধ্যে সবুজ ঘাস। ছোট বড় গাছপালায় সারাটা বাড়ি ছায়ায় ঢাকা। দাদা সাহেব নাতীদের নিয়ে বাড়ির নিচের তলায়, দরজার সামনে দাঁড়ায়। মুখ গম্ভীর।

দাদা ভাইয়েরা, বিষন্ন গলায় বলেন, এই যে দরজাটা দেখছো, এই যে জায়গাটা দেখছো– মনে হয় রক্ত মাখা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাখাল রাজার ছোট পুত্র বলেছিল, আমি মায়ের কাছে যাবো। কিন্তু... আবিদুর রহমানের গলায় কান্নার সুর। তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। দাদা সাহেবের মতো সিন্দুক অভি দোলনা অমরাবতির গলায় কান্না এসে আটকে যায়। চোখে নেমে আসে জল। রাখাল রাজার বাড়ি দেখতে আসা আরও অনেকে যোগ দেয় শোকের মিছিলে।

দাদাভাই বলেন, চলো। রাজার বাড়িটা ঘুরে দেখবে।

চলো। দাদাভাইয়ের হাত ধরে ওরা ঢোকে ইতিহাস গৃহে। সামনের ছোট ঘরটা দেখিয়ে দাদাভাই বলেন, এইরুমে নেতা পড়াশুনা করতেন।

তাই? কনফার্ম হতে চাইছে অমরাবতি।

মাথা নাড়েন দাদুভাই, হ্যাঁ। নেতা প্রচুর পড়াশুনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অনেক কবিতা তিনি আবৃত্তি করতেন। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি... গানটাকে তিনিইতো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত করলেন।

অভি পকেট থেকে ডান হাতটা বের করে তাকায় দাদাভাইয়ের দিকে, এই গানটা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা?

দাদাভাই গাল টেপেন অভির, এই জন্য তোকে শিয়াল বলি।

শিয়াল মানে?

অমরাবতি হাসে। কপাল কুঁচকে যায় অভির। সিন্দুক একটু নাচে। দোলনা মুখ ভেংচায়। আসলে ওরা অভির সঙ্গে বুদ্ধিতে পড়াশুনায় পারে না। দাদাসাহেব

শিয়াল বলায় ওরা একটু একটু খুশি। মুখে আঙুল দিয়ে গম্ভীর তাকায় অভি দাদাভাইয়ের দিকে।

দাদাভাই ঘাড় চুলকে বলেন, শুধু শিয়াল না, তুমি হলে শিয়ালপন্ডিত। এই অসাধারণ ঘটনাটা ওরা কেউ জানে? জানে না। জানলে বলতো। একমাত্র তুমিই জানো। তাই আদর করে তোমাকে শিয়াল পণ্ডিত বলেছি।

তাই বলো! অভির মুখে মিছরি হাসি।

নিচের ঘরটা ঘুরে দেখে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়, এই সিঁড়ির শেষ ধাপে মহান নেতার পবিত্র শরীর পরেছিল। বেদনামাখা গলায় বলেন দাদাভাই, ছবিতে নিশ্চয়ই দেখেছো কি পবিত্র হাসিমাখা সেই মুখ। আমার মনে হয়, নেতার হাসিমাখা মুখে গোটা বাংলাদেশ স্থির দাঁড়িয়েছিল দোয়েলের শীষে, পদ্মার উজান স্রোতের মতো।

না, দাদাভাইয়ের কথার পিঠে বলে দোলনা, তার মুখে ছিল বাংলাদেশের পতাকার হাসি।

দারুণ বলেছিসতো! দাদাসাহেব দোলনার বাবড়ি  দোলানো চুলে আদর করেন।

মোড়ানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠবার সময়ে সামনের দেয়ালের উপর পুরোনো ছোট্ট একটা সাইকেল দেখিয়ে দাদাভাইকে প্রশ্ন করে অমরাবতি, নেতা কি এতো ছোট সাইকেল চালাতেন?

গাধা একটা? দাদাভাইয়ের বলার আগে বলে অভি, এটাতো রাসেলের সাইকেল।

তুই কি করে বুঝলি এটা রাসেলের সাইকেল? গরম চোখে তাকায় দোলনা। অভির পাকামো একদম ভালো লাগে না দোলনার। দোলনা পড়ে ফাইভে। ফোরে পড়ে অভি। এক ক্লাস নিচের অভি সব জানে কি করে? মেজাজ গরম হয় দোলনার। তাকায় কড়া চোখে। গ্রাহ্য করে না অভি।

তোমরা তো পড়ালেখা করবে না। তো জানবে কি করে? রাসেলকে নিয়ে একটা বইয়ে আমি দেখেছি, রাসেল ঠিক এই রকম একটা সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে সেই এইটা সেই সাইকেল। দাদাভাই, তুমি কি বলো?

গর্বে দাদাভাই আবিদুর রহমানের বুক ভরে যায়। মনে মনে কথা বলেন, আমার নাতীটা আমাকেও অতিক্রম করে যাবে।

দাদাভাই কি বলবে? আমি ঠিকই বলেছি। আমার কাছে বই আছে। বাসায় চল, আমি দেখাবো।

তোর বই আমি ধরবো না, গাল ফুলায় দোলনা।

নো ঝগড়া। দাদাভাই নামেন রেফারির ভূমিকায়, আমরা এসেছি একটা পবিত্র ইতিহাস বাড়িতে। এখানে ঝগড়া করলে এই বাড়ির মহান মানুষেরা কষ্ট পাবেন। চলো, সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো।

উপরে, মানে দোতলায় উঠে নেতার শোবার ঘর, ডাইনিং টেবিল, খাবারের প্লেট, কাপ পিরিচ, খাট, বইয়ের আলমারী, সোফাসেট দেখে। দেখে ঘাতকের ছোঁড়া বুলেটের দাগ দরজায়। সাধারণ একটা বাড়ি। ওরা– দোলনা, অমরাবতি, সিন্দুক আর অভি গল্পে জানে, রাজার বাড়ি মানে বিরাট বাড়ি। পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ মিলে একটা মহা ঘটনা। বাড়ির সামনে থাকবে উন্মুক্ত তরবারি হাতে পাহারাদার। অথচ দেখো এখন থানার একটা ওসির বাড়ির সামনেও থাকে সাত আটজন পাহারাদার।

সব ঘুরে দেখার পর দাদাভাই একটা পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়ান। টেবিলটা দেখেন। পাশে ছোট্ট একটা চেয়ার। পুরোনো সময়ের কয়েকটি বই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা। দাদাভাই জিজ্ঞেস করেন সিন্দুককে, বলতে পারো এই পড়ার টেবিল আর চেয়ারটা কার?

সিন্দুক একা নয়, বাকি তিনজনও এক সঙ্গে উত্তর দেয়, এটা রাসেলের চেয়ার টেবিল।

দাদাভাই আবিদুর রহমান হাসেন প্রাণখুলে, তোমরা এক একটা হীরের টুকরো। আর তোমাদের কাছে রাসেল খুব নিরপদ থাকবে।

আমাদের কাছে রাসেল কিভাবে নিরাপদ থাকবে? অবাক অমরাবতি। ওকেতো মেরে ফেলেছে।

হ্যাঁ মেরেছে। কিন্তু ওর স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি তোমরা তোমাদের বুকের ভিতরে রেখে দেবে। বুকের ভেতরে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না। সুতরাং কেউ কেড়েও নিতে পারেব না। একেবারে নিরাপদ–

দোলনা, সিন্দুক আর অমরাবতি হাসে। কিন্তু অভি গম্ভীর হয়ে পাশের রুমের সামনে দাঁড়ায়।

কি হলো পণ্ডিতের? দাদাভাই মৃদু হাসেন। এগিয়ে যান অভির কাছে। অভি খুব মনোযোগ দিয়ে রুমের ভেতরে দেখছে। রুমটার মধ্যে ছোট একটা শার্ট আর একটা স্কুল ব্যাগ ঝুলছে।

দাদাভাই ইশারায় তিনজনকে ডাকেন। ওরা এগিয়ে যায়। ভেতরে তাকায়। তাকিয়েই ওদের মুখটা কেমন বেদনাতুর হয়ে যায়।

এইটা রাসেলের জামা– হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় অমরাবতি।

সঙ্গে সঙ্গে দোলনা দেখায় স্কুল ব্যাগটা, ওইটা রাসেলের ব্যাগ।

পাশে ঝুলে থাকা বড়দের প্যান্ট শার্ট দেখিয়ে জানতে চায় দোলনা, দাদাভাই ওগুলো কার?

কার আবার? দুই ভাই কামাল অথবা জামালের।

সবাই পিছনে তাকায়, অভি দুই পকেটে দুই হাত রেখে সামনের রুমের দিকে যাচ্ছে। ভাবখানা, ও কাউকে চেনে না। একাই এসেছে ইতিহাস বাড়িতে।

ইতিহাস বাড়িটা দেখা শেষ। বিকেল। সূর্য নেমেছে পশ্চিমে। লম্বা ছায়া লুটিয়ে পরেছে রাস্তার উপর। আবার গেটে এসে দাঁড়ায় আবিদুর রহমান। সঙ্গে দোলনা অমরাবতি সিন্দুক আর অভি। গেট পার হয়ে সামনের রাস্তার উপর দাঁড়ায় সবাই। বাড়িটাকে অলৌকিক স্টিমার মনে হয়। জলে স্থলে চলে, যায় বাড়ি বাড়ি। লিখে যায় রক্তের কাহিনী..।

কেমন লাগলো তোমাদের? দাদা জানতে চান।

মাথা নাড়ায় সিন্দুক, খুব ভালো লেগেছে আমার। অনেক কিছু জানতে পারলাম।

এই ইতিহাস বাড়ির ঘটনা বইতে অনেক পড়েছি। কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম– বন্ধুদের বলবো এই বাড়িতে আসতে– উত্তর দেয় অমরাবতি।

তোমার কেমন লাগলো? দাদাভাই জানতে চান দোলনার কাছে।

দোলনা হালকা দোল খেতে খেতে উত্তর দেয়, অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে। এই ইতিহাস বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসার জন্য আজ রাতে তোমার মাথার পাকা চুল বেছে দেবো।

সবাই হাসে কিন্তু অভি গম্ভীর। দুই হাত দুই পকেটে।

দাদাভাই আবিদুর রহমান অবাক, তুমি কিছু বললে না যে!

দাদাভাই, আমার মনে হয় রাসেলের নামে রাসেলের জন্য একটা যাদুঘর হওয়া উচিত। যে যাদুঘরে রাসেলের জামাকাপড় বই স্কুলের ব্যাগ খাবারের প্লেট পিরিচ জুতো সব থাকবে। আমরা এসে সেই যাদুঘরে রাসেলকে খুঁজবো। রাসেল আমাদের সঙ্গে গল্প করবে। রাসেল আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধা আবিদুর রহমান দুই হাতে তুলে ধরেন অভিকে। সিন্দুক অমরাবতি দোলনা তাকিয়ে, ওরা দেখতে পাচ্ছে– আকাশের ওপার থেকে নেমে আসছে রাসেল নামের এক অলৌকিক রাজপুত্তুর, রাসেল যাদুঘরে সবাইকে স্বাগত জনাতে।♦

# শিক্ষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও দর্শন

**মঈনুল হক চৌধুরী**

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাই তার সহজাত প্রবৃত্তি। এই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন পেশায় অবতীর্ণ হতে হয়। তাই বিভিন্ন পেশার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে আমাদের এই সমাজে। সমাজে যে সমস্ত পেশা সম্মানের চোখে প্রতীয়মান, শিক্ষমণ্ডলি তাদের মধ্যে অন্যতম। উল্লেখ্য, বাবা-মা কিংবা পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে, ব্যক্তিকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন একজন শিক্ষক। যাকে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। সত্যিকার অর্থে একজন প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বিচক্ষণ শিক্ষক সমাজ বদলে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। একজন আদর্শবান শিক্ষকই পারেন একটি আদর্শবান সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দিতে। একজন শিক্ষক সমাজের সকল নেতিবাচকতা, অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো দিয়ে আলোকিত করতে পারেন। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষ করে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজ উন্নয়নে তার ভূমিকা অপরিসীম। তিনি জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করে থাকেন। শিক্ষকের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সুনাম শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বিদ্যমান থাকে এমনটি নয়। একজন শিক্ষক, আদর্শ মানব সৃষ্টির শৈল্পিক কারিগর। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দেশনা এবং আদর্শ, স্থান, কাল, পাত্র, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণে ব্যাপৃত হয়। তাই বলা হয় ব্যক্তি মানব এখানে অর্থহীন কিন্তু ব্যক্তি শিক্ষক সকলের শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্র। শিক্ষকের শিক্ষাদর্শন সার্বজনীন কল্যাণকর। একে নির্ধারিত ফ্রেমে আবদ্ধ করা যায় না। কাজেই শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্যকে শুধুমাত্র বিদ্যালয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়

না। তিনি সমাজ এবং রাষ্ট্রের পর্যায়েও বহুবিদ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করে থাকেন। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাঁকে কঠিন, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মহান দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষক একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক। শিক্ষক সমাজেরই একজন প্রভাবশালী সচেতন প্রতিনিধি। আদর্শ শিক্ষককে সমাজ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সামাজিকতা, জনসচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক বিভিন্ন কাজে নেতৃত্বদান, জনমত গঠন, করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সামাজিক বিবাদ-মীমাংসা, অপরাধপ্রবণতা রোধে করণীয় নির্ধারণ এবং সামগ্রিক উন্নয়ন অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি ভূমিকা পালন করতে হয়। সংস্কৃতে একটি কথা আছে, 'গুরু শিষ্যকে যদি একটি অক্ষরও শিক্ষা দেন, তবে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই, যা দিয়ে সেই শিষ্য গুরুর ঋণ শোধ করতে পারে'।

উল্লেখ্য, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। তাই শিক্ষিত জাতি গঠনের মধ্য দিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শিক্ষককে তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি যথার্থ বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চাই।' সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই সেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তিনি জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সোনার মানুষ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিক্ষার প্রকৃত অনুরাগী। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত তাঁর ৩টি গ্রন্থে (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়া চীন) তিনি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্য প্রেম শিক্ষা ভাবনা ও মানব কল্যাণে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম ভিত্তিভূমি হচ্ছে তাঁর শিক্ষাদর্শন। অর্থাৎ শিক্ষাকে রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে জনগণের জন্য গণমুখীশিক্ষা প্রসারে তিনি তাঁর কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। ১৯৭০সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে নভেম্বর মাসে রেডিও- টেলিভিশনে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা বিষয়ে বেশকিছু কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে।' ঐ বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, পাঁচবছর বয়সী শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল

শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দারিদ্র যেন মেধাবীদের জন্য বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শিক্ষাকে গণমুখী ও সার্বজনীন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মানোন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার অপর নাম আত্মসচেতনতা ও উন্নয়ন। তাই সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষকের মর্যাদা প্রশ্নটি বিশেষভাবে জড়িত। এ বিবেচনায় শিক্ষক সমাজের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম। তিনি শিক্ষকদের সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন এবং শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪১ সালের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঐ সময় একজন মুসলিম ছাত্র অন্যায়ভাবে মারপিটের শিকার হন। এ নিয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্র দাশগুপ্তের কাছে বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসা চান। নরেন্দ্র দাশগুপ্ত অন্য অনেকের সহায়তা নিয়ে ঘটনাটি মীমাংসা করে দেন। বঙ্গবন্ধু প্রধান শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘটনাটি যেভাবে মীমাংসা করা হয় সেভাবেই মেনে নেন এবং পরিস্থিতি শান্ত করেন। ১৯৪২ সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে যে 'বেকার' হোস্টেলে থাকতেন সাইদুর রহমান ছিলেন সেই বেকার হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক। অসাম্প্রদায়িক ও উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন। বর্তমানের পর্যটন কর্পোরেশন আওতাভুক্ত হোটেল সৈকত তখন চট্টগ্রাম রেস্ট হাউজ নামে পরিচিত ছিল। শিক্ষা সফরে থেকে জগন্নাথ কলেজের একদল ছাত্র নিয়ে সেখানেই উঠেছেন কলেজের জনপ্রিয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ শাহাদত আলী ও অধ্যাপক ওয়াকেফ হোসেন চৌধুরী (অধ্যক্ষ হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত)। প্রাক্তন মন্ত্রী জহুর আহমেদ চৌধুরী ছিলেন শ্রমিক লীগের নামকরা নেতা। কোনো একটি বিষয় নিয়ে হোটেলে অবস্থানরত জনৈক ছাত্র এবং এক হোটেল বয়ের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং একপর্যায়ে ছাত্রটি হোটেলবয়কে চপেটাঘাত করে।

ঘটনার পর বর্ণিত শিক্ষকদ্বয় হোটেল ম্যানেজারের সহায়তায় ঘটনাটি মীমাংসা করে দেন এবং হোটেল বেয়ারাকে একশত টাকা দেন। ঘটনাটির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। শিক্ষা সফর শেষে হোটেল ত্যাগ করার সময় সমাগত, হোটেল বিল পরিশোধ করে শিক্ষা সফরের বাসে মালপত্র তোলা হয়ে গেছে, এমন সময় ঝড়ের গতিতে সেখানে উপস্থিত হন তৎকালিন নামকরা শ্রমিক নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী। মারমুখী হয়ে বললেন, 'কাউকে ফেরত যেতে দেব না,

কর্ণফুলীর পানি এদের রক্তে রঞ্জিত করা হবে'। অনেক তর্ক বিতর্কের পর পূর্বে সংঘটিত ঘটনার মাশুল হিসেবে পাঁচশত টাকা তাকে পরিশোধ করে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ ঐ স্থান ত্যাগ করার সুযোগ পায়। এই ঘটনার বেশকিছুদিন পর হোটেল ইডেনে চলছিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা। এ সভায় জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি রাজিউদ্দীন আহমেদ রাজু (প্রাক্তন মন্ত্রী ও সাংসদ) ও অন্যান্য ছাত্রনেতারা ঘটনাটি বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। বঙ্গবন্ধু ঘটনা শুনে ব্যথিত হন এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষক প্রফেসর সাইদুর রহমানের কাছে ছুটে গিয়ে চট্টগ্রামের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ঘটনার সময় উপস্থিত শিক্ষক ড. মোহাম্মদ শাহাদত আলীর কাছেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ঘটনার খেসারত হিসেবে তাঁর দেয়া পাঁচশত টাকা তাকে ফেরৎ দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'টাকাটা আমার নয়, জহুর চৌধুরীর কাছ থেকে আদায় করেছি'। মুঘল বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে মর্যাদা না দেয়ায় নিজ পুত্রকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষায় যা করলেন তা সত্যিই একটি বিরল ঘটনা। ১৯৭২সালে পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনদেশে ফিরে এসেছেন বঙ্গবন্ধু। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের পর্বতময় সমস্যা মোকাবেলায় রাতদিন পরিশ্রম করছেন বঙ্গবন্ধু। এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা ছাড়াই ডিগ্রি প্রদানের জন্য আন্দোলন শুরু করলো। পরীক্ষার্থীদের দাবি ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তারা লেখাপড়া করতে পারেনি এমনকি যুদ্ধ শেষে দেশে তারা বই খাতা ও নোটপত্রও খুঁজে পাচ্ছে না। সেসময় আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীদের দাবিও কিছুটা যুক্তিযুক্ত ছিল। তবে পরীক্ষা ছাড়া ডিগ্রি প্রদান করলে দেশ বিদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা দারুণভাবে ক্ষুন্ন হবে বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের এ দাবি সরাসরি নাকচ করে দেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ের প্রশ্নে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে এবং প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ছাত্রদের দাবির কাছে কোনো ভাবেই নতি স্বীকার করতে রাজি হলেন না। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সামগ্রিক বিষয়টি আলোচনার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহবান করেন। একাডেমিক কাউন্সিলের প্রায় সকল সদস্যই ছাত্রদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বক্তব্য রাখেন। এ খবর জানতে পেরে দাবি আদায়ে মরিয়া ছাত্ররা একাডেমিক কাউন্সিলের সভাকক্ষ অবরোধ করে। শুধু তাই নয় ছাত্ররা সভাকক্ষের পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্ধকরাচ্ছন্ন সভাকক্ষের পরিবেশ ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক মোকারম হোসেন খন্দকারসহ কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক সভাকক্ষে

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থা চলাকালে তৎকালিন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদের এক জরুরি সভা চলছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের দ্বারা অবরুদ্ধ আছেন এমন সংবাদ পেয়ে তিনি খুবই বিচলিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদের সভা স্থগিত করে তিনি ছুটে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সভাকক্ষে। বঙ্গবন্ধুর গাড়ি আসছে দেখতে পেয়ে অবরোধকারী ছাত্ররা দ্রুত পালিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু অবরুদ্ধ কাউন্সিল কক্ষে প্রবেশ করেন এবং অবরুদ্ধ শিক্ষকদের উদ্ধার করেন।

অতঃপর তিনি শিক্ষকদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেন এবং ছাত্রদের এই বাড়াবাড়ির জন্য সরকার প্রধান হিসেবে দুঃখ প্রকাশ করে নিজ দপ্তরে ফিরে যান। এই হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উল্লেখ্য, আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে ঐশী জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টিকর্তা, মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের নীতিমালা শিক্ষা দান করেছেন। তিনি নিজেই এ পরিচয় তুলে ধরে ঘোষণা করেছেন- 'শিক্ষক হিসেবে আমি প্রেরিত হয়েছি (ইবনু মাজাহ : ২২৫)।' শিক্ষাকে যাবতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলে শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে এর বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে নাজিলকৃত প্রথম আয়াতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না (আলাক, ১-৫)। আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন- 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর বিদ্যার্জন করা ফরজ (ইবনু মাজাহ : ২২০)।' একজন প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্যিকারভাবে শিক্ষিত শিক্ষক সমাজ বদলে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। আদর্শ শিক্ষকই শুধু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে পারেন। এ জন্যই শিক্ষকতাকে অপরাপর পেশার মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না বলে অনাদিকাল থেকে এটি একটি সুমহান পেশা হিসেবে সমাজ-সংসারে পরিগণিত। ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এদিনে বিশ্বের সকল শিক্ষককে জানাই আমাদের হৃদয়ের অন্তরস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।♦

# অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

# রাসূলপ্রেমিক আলেম

## মো. বশির হোসেন মিয়া

আল্লাহ জাল্লাশানুহু আম্মান আলাহু, আল্লাহ হাফেজ ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এসব কথাগুলো আজকাল বেশ প্রচলিত। এক সময় এসব শব্দসমূহ আলেমদের কথায় এবং লেখনিতে তেমন উচ্চারিত হতো না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আশির দশকের শুরুতে যার লেখনি ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তিনি হলেন সমকালীন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আধ্যাত্মিকতা ও ইলমে তাসাউফ শিক্ষার অগ্রদূত, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর শান, মান ও মর্যাদা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম একটি নাম, একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হাক্কানী আলেম। তিনি ১৯৪৪ সালের ৩০ এপ্রিল বর্তমান মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার দ্বারিয়াপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলিয়ে কামেল ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দীদে যামান মুহ্ইয়স সুন্নাহ, আমীরুশ শরীয়ত হযরত মওলানা শাহ সূফী আলহাজ্ব আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম প্রধান খলিফা

নায়েবে মুজাদ্দীদে যামান হযরত মওলানা শাহ সূফী আলহাজ্ব তোয়াজউদ্দীন আহমদ (র) এবং মাতা বাংলার তাপসী রাবেয়াখ্যাত মোছা. জোহরা খাতুন (র)।

অত্যন্ত প্রতিভার অধিকারী শিশুটি ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর বড় ভাই হুজুর কিবলার প্রথম সন্তান আবুল বাশার মুহম্মদ আবদুল হাই (র)। যিনি শৈশবেই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। সেহেতু শিশু আবুল হাসান একটু বেশিই স্নেহাশীর্বাদ ও আদর যত্ন পেয়েছেন। ছোটবেলায় তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি মা মোছা. জোহরা খাতুনের কাছে। তিনি শৈশবেই মাতার কাছে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর আব্বা আলেমে হাক্কানীর কাছে বাল্যকাল থেকেই আধ্যাত্মিকতা শিক্ষার মাধ্যমে শৈশবের পাঠ শেষ করেন।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের দ্বারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। ছাত্র অবস্থায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পিতার কাছে ইলমে তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এরপর খুলনা বিকে ইনস্টিটিউট ও মাগুরা হাই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকা সরকারি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মাদ্রাসা শাখা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষায় চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর জেনারেল শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভর্তি হন। পরে ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সালে পিতা উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী তোয়াজউদ্দীন আহমেদ (র) তাঁকে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইলমে লাদুনীর ছবক দেন। আর যারা এ ছবক লাভ করেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিগুঢ় জ্ঞানের অধিকারী হন। তাইতো তাঁর লেখনী ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বক্তৃতায় বিজ্ঞজনেরা এসব অনুধাবন করতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় তাঁর বিশেষ অবদান স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলাদেশের আলেম সমাজের অহংকার। বর্তমান সময়ের হাক্কানী আলেম ওলামাগণ তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ করতেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতেন।

হাসান আব্দুল কাইয়ূম এর পেশাগত জীবন শুরু হয় কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। তিনি মাগুরার শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজ, মাগুরার হোসেন শহীদ

সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকার হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮০ সালে জানুয়ারি মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তিতে পরিচালক পদে উন্নীত হন এবং ২০০২ সালে সফলতার সাথে কর্মজীবন শেষ করে অবসর নেন। তিনি মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকারও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত অবস্থায় তাঁর মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যেমন– তাফসিরে তাবারি, বুখারি শরিফ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইসলামি বিশ্বকোষে তাঁর অনেকগুলো মৌলিক ও অনূদিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে। তিনি ছোট বড় বিভিন্ন বয়সী পাঠকদের জন্য লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো– অনুপম আদর্শ, ফুরফুরার চাঁদ, প্রসঙ্গ ইসলাম, ইসলাম ও জীবন, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, খোকা-খুকুর ছড়া, জিহাদ, কাদেরিয়া তরিকা, তা'লীমে তাসাউফ ইত্যাদি।

এ ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় ১৯৭২ সালে 'নবকাল' নামে মাগুরা থেকে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ছয় সহস্রাধিক।

তিনি তাঁর পিতার স্মরণে আঞ্জুমানে তোয়াজিয়া নামে একটি জনকল্যাণ মূলক সংস্থা গড়ে তুলেছেন। দারিয়াপুর দরবার শরিফে তিনি গড়ে তুলেছেন আঞ্জুমানে তোয়াজিয়া নামে একটি এতিমখানা। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফুরফুরা সিলসিলার দ্বারিয়াপুর দরবার শরীফের গদিনশিন পীর ছিলেন।

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম (র) গত বছর ৬ অক্টোবর মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অগণিত মুরিদ ভক্ত ও শুভাকাঙ্খীদের চোখ পানিতে ভাসিয়ে এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

ইসলামের সৌন্দর্য্যকে তিনি সবসময় সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কেউ এসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে তিনি কুরআন হাদিসের আলোকে জবাব দিতেন। বিশেষ করে মীলাদ কিয়াম ও ঈদে মীলাদুন্নবীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন সোচ্চার এবং রসূল (সা)-এর শান মান মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে ছিলেন অবিচল। তিনি ছিলেন এককথায় সত্যিকার অর্থে ফানাফিস শায়েখ ও ফানাফির রাসূল।

তিনি আফ্রিকার লিবিয়া ও গাম্বিয়ায় ৪/৫ বার পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে বিশ্ব পীরদের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন অনেক বিখ্যাত আলেম ওলামাদের উপস্থিতিতে। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরবি,

ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ও হিন্দী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইত্তেফাক, ইনকিলাব, জনকণ্ঠ ও ইংরেজি ডেইলি সান পত্রিকায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে কলাম লিখতেন। ১৯৮০'র দশক থেকে তিনি ইত্তেফাক পত্রিকায় নিয়মিত মাহে রমজানের উপর লিখতেন।

তাঁর প্রথম ওফাতবার্ষিকিতে ভক্ত, অনুরাগী ও প্রিয়জন তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করছে। এমন একজন জ্ঞানতাপসকে হারানোর বেদনা সত্যি কষ্টদায়ক। পীর-মুরীদীতে কম সময় দিলেও বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে তিনি জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা অনেকটা নিবারণ করেছেন। আরো অবদান রেখেছেন টিভি-রেডিও বক্তৃতা ও তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে।

তাঁর আব্বা হুজুর হজরত মওলানা শাহসূফি তোয়াজউদ্দীন আহমদ (র) তাঁকে ১৯৮৬ সালে ফুরফুরা শরীফ নিয়ে যান এবং ফুরফুরার মুজাদ্দীদেযামান (র)-এর মেজো সাহেবজাদা মুফতীয়ে আযম বাংলা ও আসাম পীর আল্লামা আবু জাফর মোহাম্মদ অজীহুদ্দীন মুস্তফা সিদ্দিকী সাহেবের হাত দিয়ে তাঁকে দেয়া দাদা হুজুর কিবলা (র)-এর খেলাফতনামা ও পাগড়ী হস্তান্তর করেন। সঙ্গে ছিলেন তাদের প্রিয় খন্দকার হাসেম আলী। এই মুহূর্তে এক হৃদয়বিদারক ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয় যা উপস্থিত সকলে অবলোকন করেন।

এরপর ১৯৯২ সালের ১৬ জুন হুজুর কিবলা (র)-এর ইন্তেকালের পর অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত (কায়েম মাকাম) হন এবং আমৃত্যু গদীনশীন পীর হিসেবে দ্বারিয়াপুর দরবার শরীফে তাঁর উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, গদীনশীন পীরসাহেব ২০০৬ সালে সস্ত্রীক হজ্জব্রত পালনের সময় হুজুর (সা)-এর রওজা মোবারকের সামনে তাঁর একমাত্র সাহেবজাদা আলহাজ্ব শাহ আরিফ বিল্লাহ মিঠুকে খিলাফতের স্মৃতিস্বরূপ পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং তাঁর অবর্তমানে দ্বারিয়াপুর দরবার শরীফের গদীনশীন মনোনীত করেন।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ইসলামী তাৎপর্যপূর্ণ দিনগুলোতে তেমন কোনো প্রবন্ধ নিবন্ধ দেখা যায়না। অথচ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম (র)-এর জীবদ্দশায় এসব দিনগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্রসহ অনেক লেখা দেখা যেত। সে কারণে অগণিত পাঠক, ভক্ত ও অনুরাগীর কাছে তিনি অনেক বেশি দুষ্প্রাপ্য। তাঁর অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। প্রথম ওফাত বার্ষিকীর এ দিনে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের দোয়া ও নেক বাসনা পূরণ করুন। আমিন।♦